ব্ল্যাক মার্কেট

শ্রীপরিমল গোস্বামী

চিত্রণ :

শ্রীকালীকিঙ্কর ঘোষ

জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেড
১১৯, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রকাশক : শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস, এম-এ
জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিঃ
১১৯, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ
জুলাই, ১৯৪৫
মূল্য দুই টাকা

প্রিণ্টার : শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শীল
শ্রীকৃষ্ণ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
২৭বি, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শ্রীসরোজ আচার্য
প্রীতিভাজনেষু

শ্রীপরিমল গোস্বামীর গ্রন্থাবলী।

ব্ল্যাক মার্কেট

ঘুঘু

ট্রামের সেই লোকটি

দুষ্মন্তের বিচার

ডিটেক্‌টিভ শিবনাথ

ক্যামেরার ছবি

আষাঢ়ে দেশে

বুদ্বুদ (ছাপা নাই)

মহামন্বন্তর



রূপান্তর

বিজ্ঞান এসে ব্যাখ্যা না করা পর্যন্ত অনেক জিনিষই আমাদের সাধারণ বুদ্ধিতে অলৌকিক ব'লে মনে হয়। এই রকম একটি অলৌকিক কাহিনীর কথাই বলছি।

বেশি দিনের ঘটনা নয়।

রেভারেণ্ড কিং আমাদের পাড়ায় থাকেন। একেবারে খাঁটি ইংরেজ এবং খাঁটি খ্রিষ্টান। সেবাধর্মে, অহঙ্কারহীনতায়, বিনয়ে, আদর্শ পুরুষ। তাঁকে ভাল-না বাসে এমন লোক আমাদের গড়িয়াহাটা অঞ্চলে নেই।

একটি দোতলা বাড়িতে তিনি থাকেন, কিন্তু নীচের তলাটি একটি গরিব পরিবারকে অতি শস্তায় ভাড়া দিয়েছেন—তত শস্তায় কলকাতায় এ রকম একতলা পাওয়া যায় না।

তিনি বিশেষ করে গরিবদের বন্ধু। তাঁর চোখে ছোটবড় ধনী-দরিদ্রে ভেদ নেই ; ভারতবাসী ব'লে কাউকে তিনি দূরে সরিয়ে রাখেন না ; সবাইকে বুকে টেনে নেন। রোগীর সেবা করেন নিজহাতে। বস্তী অঞ্চলে সবাই তাঁকে দেবতা ব'লে জানে।

প্রথম প্রথম আমরা ক'জন বন্ধু তাঁকে সন্দেহ করেছি ; সেবাধর্মের আবরণে আসলে তিনি খ্রিষ্টানধর্ম প্রচার করতে চান। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই সে ভুল আমাদের ভেঙেছে।

তাঁর সরল মনে কোনো কু-অভিপ্রায় থাকতে পারে না ; আমরাও তাঁর কাছে আমাদের মনের কথা খোলাখুলি ভাবেই বলতাম। তিনি যে আসলে সেবাপ্রাপ্ত লোকদের খ্রিষ্টান করতেই চান, আমাদের মনের এই সন্দেহের কথাও এক দিন তাঁকে বললাম।—

আপনি আমাদের এত উপকার করছেন, গরিব রোগীকে ওষুধ দিচ্ছেন, সহায়হীনকে আর্তকে নিজহাতে সেবা করছেন—এ পর্যন্ত বেশ ভালই, এ জন্যে আমরা আপনার কাছে বিশেষ ভাবে ঋণী, কিন্তু শেষে যদি দেখি আমাদেরই কোনো বন্ধুকে আপনি খ্রিষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষিত করছেন, তা হ'লে আপনার উপর আমাদের সবার শ্রদ্ধা নষ্ট হয়ে যাবে।

রেভারেণ্ড কিং এ কথার উত্তরে হেসে বললেন, সে ভয় অপনাদের নেই, আমি খ্রাইষ্টের বাণী আমার কাজের ভিতর দিয়ে প্রচার করি—জনসেবার ভিতর দিয়ে আমি তাঁরই সেবা করি, তার বেশি তো আমি কিছুই চাই না। আমার ধর্মে দীক্ষিত ক'রে অকারণ খ্রিষ্টানদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা আমি গৌরবের মনে করি না।

তিনি আরও বললেন, ধর্ম হচ্ছে সম্পূর্ণ অন্তরের জিনিস, বাইরে একটা নাম তার থাকে বটে কিন্তু পৃথক ভাবে তার কোনো দামই নেই। কোটি কোটি খ্রিষ্টান আজ হিংসায় মত্ত, তারা খ্রিষ্টান হয়ে পৃথিবীর কি লাভ হল ?

রেভারেণ্ড কিং-এর কাছে আমাদের মাথা নত হ'ল। এ রকম কথা একজন খ্রিষ্টানের মুখে এই প্রথম শুনলাম। আমরা তাঁর ভক্ত মাত্র ছিলাম, এবারে তাঁর অনুগত হ'য়ে পড়্‌লাম। আমাদের মধ্যে প্রীতি এবং অন্তরঙ্গতা এত বেড়ে

গেল যে শেষ পর্যন্ত আমরা কয়েকজন বন্ধু তাঁর সঙ্গে রীতিমতো সেবার কাজ আরম্ভ করলাম।

কিন্তু তাঁর সঙ্গে কাজ ক'রে আমরা পারব কেন?

তাঁর শাদা চুলের নীচে যে শুভ বুদ্ধি এবং শাদা দাড়ির নীচে যে সহৃদয়তা ছিল, তা আমাদের প্রতিপদে লজ্জা দিতে লাগল। তাঁর ষাট বছর বয়সেও যে উদ্যম এবং কর্মপটুতা ছিল তাও আমাদের মতো যুবকদের মধ্যে কারো ছিল না।

তবু আমরা যতদূর সম্ভব তাঁর সঙ্গে থেকে তাঁর কাজে সাহায্য করতে লাগলাম। আমাদেরই প্রতিবেশীরা কি রকম দুঃস্থ অবস্থায় দিন কাটায় তা আমরা এতদিন দেখেও দেখিনি। অসুস্থ হ'লে তারা বিনা চিকিৎসায়, বিনা পথ্যে মারা পড়ে—তা আমরা এতদিন এমন ক'রে প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পাইনি।

আমরা তাঁর জনসেবার রূপ দেখে বিস্মিত হ'য়ে তাঁর কাছে কত কৃতজ্ঞতা জানিয়েছি। বলেছি, আপনি এদের জীবন দান করছেন।

কিন্তু তার উত্তরে তিনি বলতেন, একজনকে দুজনকে বাঁচিয়ে আপনাদের বিরাট ভারতবর্ষের দুঃখ ঘোচাব কি ক'রে? আমি যে সেবা করছি, এ সেবার মধ্যে আমি সম্পূর্ণ গৌরব অনুভব করিতে পারি না।

কেন? আমরা প্রশ্ন করি।

এদের যেমন সেবা করছি, তেমনি সেই সঙ্গে আপনাদের সবাইকে যদি এদের প্রতি দৃষ্টি ফেরাতে পারতাম তা হ'লেই আমার সেবা সার্থক হ'ত।

তারপর একটু থেমে আমাদের দিকে চেয়ে রইলেন। বোধ হয় বুঝতে চেষ্টা করলেন—আমরা তাঁর কথাটির মর্ম ঠিক মতো গ্রহণ করতে পেরেছি কি না। আমাদের দিকে চেয়ে তিনি কি বুঝলেন জানি না, তবে তিনি বলতে লাগলেন, আপনাদের দেশের লোককে আপনারা অস্পৃশ্য ক'রে রেখেছেন, অথচ এ দেশের লোক তারা। আপনাদের কাছে তারা কিছুই পায় না। আমরা দূর দেশ থেকে এসে আপনাদের অপরিচিত আদিবাসীদের মধ্যে গিয়ে মিশি, তাদের সেবা করি, তাদের সঙ্গে আধুনিক জগতের পরিচয় করিয়ে দেবার চেষ্টা করি, তারপর যখন আপনারা দেখেন ওরা আমাদের ভালবাসতে শুরু করেছে, তখন আপনারা আমাদের বিরুদ্ধে লাগেন। কিন্তু বলুন তো আমাদের দোষ কি? আপনারা কোনো দিন যাদের স্পর্শ করেন না, চেনেন না, তারা যে আপনাদের দেশের লোক, একথা বলতে আপনাদের মতো শিক্ষিত লোকের লজ্জা পাওয়া উচিত নয় কি?

লজ্জা যে পাওয়া উচিত এ বিষয়ে আমাদের মনে কোনো সন্দেহ থাকে না।

রেভারেণ্ড কিং শুধু সেবকই নন, তিনি মানুষ হিসাবে সব দিক দিয়েই মহৎ। তাঁর সঙ্গে কাজ ক'রে আমরা নিজেদের ধন্য মনে করেছি। মানুষের সেবা করতে গিয়ে আমরা বুঝতে পেরেছি এ কাজটি সহজ নয়। পদে পদে অসুবিধা আছে। যাদের সেবা করতে যাওয়া যায়, তারা সন্দেহ করে, তারাই অনেক সময় বাধা দিতে চায়। চারিদিকে সঙ্কীর্ণতা এবং স্বার্থপরতা স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে চোখের সামনে। উৎসাহ কমে যায়, মনে হয় কি দায় পড়েছে এ সব করবার।

কিন্তু যখনই উৎসাহ নিবে যায়, রেভারেণ্ড কিং-এর কথা মনে পড়ে। তিনি সকল সঙ্কীর্ণতার উর্ধ্বে মাথাটি সর্বদা তুলে ধ'রে আছেন। শিশুর মতো সরল হাসি তাঁর মুখে লেগে আছে। সে হাসি তাঁর অন্তরের পরম আনন্দের প্রতিফলন। সেই ছবিটি মনে জাগে। তখন আমরা আবার উৎসাহ পাই।

একটি বিশেষ কেন্দ্রে আমরা জনসেবা আরম্ভ করেছিলাম, আমাদেরই বালিগঞ্জ অঞ্চলের এক বস্তীতে, কিন্তু আমাদের কর্মক্ষেত্র অল্পদিনের মধ্যেই বিস্তৃত হ'য়ে পড়ল।

তার কারণ জাপানী বোমা পড়তে শুরু করল কলকাতাবাসীদের মাথায়। দলে দলে লোক পালাতে লাগল শহর ছেড়ে। মানুষ ভয়ে যে কি পরিমাণ দিশাহারা হয়ে পড়ে, তার ব্যাপক ছবি দেখলাম এই প্রথম; যার যা কিছু ছিল—তাই নিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে। কিন্তু ট্রেনে চাপার পর দেখছে সম্পত্তির বারো আনাই নেই। ঘোড়ার গাড়ি, ট্যাক্সি, রিকশা সবাই দশগুণ বেশি ভাড়া নিয়েছে, তারপর টিকিট কয়ার ব্যাপারে তার যা সাধ্য ঘুস দিয়েছে; ট্রেনে একটু জায়গা পাওয়ার জন্যেও প্রচুর টাকা দিতে হয়েছে, উপরন্তু কুলিরা মালপত্র নিয়ে স'রে পড়েছে। ট্রেনে ছেলেমেয়ে সবাই মিলে পদদলিত এবং নিষ্পিষ্ট হয়ে দেশে গিয়ে যেটুকু অবশিষ্ট রইল, তাও গেল সেখানে চোরের হাতে।

রেভারেণ্ড কিং একবার মাত্র বলেছিলেন, অসহায় লোকদের দুর্দশার সুযোগ নিয়ে এদেশের ভদ্র অভদ্র সবাই একসঙ্গে চোর হ'য়ে ওঠে—পৃথিবীতে আর কোনো দেশে এ রকম নেই।

তাঁকে এবারে অত্যন্ত বিচলিত দেখা গেল। আমাদের ক'জনের সাধ্যে যতদূর কুলোয় ঝগড়া মারামারি ক'রেও পলায়মান যাত্রীদের ট্রেনে ওঠায় সাহায্য করতে লাগলাম।

সেদিন রাত নটা আন্দাজ সময় আমরা হাওড়া থেকে ফিরছি। আমরা

ডালহৌসী স্কয়ারের কাছাকাছি আসতেই হঠাৎ সাইরেন বেজে উঠল। তাড়াতাড়ি আমরা যে যেখানে পারলাম গর্তে আশ্রয় নিলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই বোমা পড়তে শুরু হ'ল। মনে হ'তে লাগল বোমা সব আমাদের কাছেই পড়ছে—মৃত্যু অনিবার্য। ভাবতে ভাবতেই আমাদের গর্তের খুব কাছেই ভীষণ এক আওয়াজ!

রেভারেণ্ড কিং আশ্রয়ে ঢোকার আগেই বিপদের কথা ভেবে চঞ্চল হয়ে উঠেছিলেন। কত লোক হয় তো মরবে, অথচ সে সময় বেরিয়ে কিছু করার উপায় নেই।

সুদীর্ঘ তিন ঘণ্টা পরে অল ক্লিয়ার বাজল। তখন বেরিয়েই নিজেদের কে কোথায় আছে খোঁজ নিতে গিয়ে দেখি সর্বনাশ হয়েছে। রেভারেণ্ড কিং অজ্ঞান হ'য়ে পড়েছেন। এ-আর-পীর তৎপরতায় তাঁকে হাসপাতালে নেওয়া হ'ল, ডাক্তার বললেন, 'শক্' পেয়েছেন, অবস্থা অনিশ্চিত।

উপায় কি? আমরা ব্যস্তভাবে প্রশ্ন করলাম।

ডাক্তার বললেন, দেখা যাক। বলেই চিকিৎসা শুরু করলেন।

রেভারেণ্ডের সম্পূর্ণ সুস্থ হ'তে বেশ কিছুদিন লাগল। হাসপাতাল থেকে তাঁকে বাড়িতে এনে আমরা দীর্ঘদিন তাঁর শুশ্রূষা ক'রে তাঁকে সবল ক'রে তুললাম এবং তিনি সবল হওয়া সত্ত্বেও আমরা তাঁকে আরও দু'এক মাস বিশ্রাম নিতে অনুরোধ করলাম। তিনিও সহজেই রাজি হলেন এবং বললেন কিছুদিন শুয়ে থাকতেই চাই, ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে আর ইচ্ছে করে না।

এ কথার অর্থ তখন বুঝতে পারিনি, কিন্তু পরে পেরেছি। তখন ভেবেছিলাম এত বড় একটা দৈহিক বিপর্যয় কাটিয়ে উঠে তাঁর মনে অবসাদ এসেছে। তাই মনে হ'ল তাঁকে নিয়ে রোজ একটু একটু বেড়ানো দরকার। তিনি এতে সহজেই রাজি হ'লেন।

রেভারেণ্ড কিংকে সঙ্গে নিয়ে আমি সেদিন ট্রামে উঠলাম। একটা খালি সীট পেয়ে আমরা দুজনে একসঙ্গে তাতে বসলাম। রেভারেণ্ড কিং বসলেন জানলার ধারে, আমি তাঁর পাশে। ইতিপূর্বে ট্রামের মধ্যে কখনও তাঁকে বড় বসতে দেখিনি কেননা অন্য কেউ দাঁড়িয়ে থাকলে তিনি আসন ছেড়ে দিয়ে নিজে দাঁড়িয়ে থাকেন। সে দিন ট্রামে লোক বেশি ছিল না, শহরেরই লোক প্রায় খালি হয়ে গেছে।

কিছুক্ষণ চলতেই হঠাৎ অনুভব করলাম, রেভারেণ্ড কিং তাঁর দুটি হাঁটু জাপানী পাখার মতো ছড়িয়ে আমাকে ঠেলে রাখলেন। তাঁর পাশে আমার

আসন এমন সঙ্কীর্ণ হ'য়ে এল যে আমি তৎক্ষণাৎ সতর্ক না হ'লে আসন থেকে নীচে পড়ে যেতাম।

আমাকে তিনি এমন ঠেলে রাখলেন যে হঠাৎ আমার মনে কেমন যেন একটা সন্দেহ জেগে উঠল। কেননা এমন স্বার্থপর ব্যবহার তাঁর কাছ থেকে যে কখনও আশাই করা যায় না। তবে কি তাঁর চরিত্রে কোনো গুরুতর পরিবর্তন ঘটে গেল? আর এই কি সেই পরিবর্তনের প্রথম লক্ষণ?

আমি মনোযোগের সঙ্গে তাঁর ব্যবহার এবং চালচলন লক্ষ্য ক'রে যেতে লাগলাম। ক'দিনের মধ্যেই তাঁর সম্পর্কে আমাদের সমস্ত মত বদলে গেল। তাঁর ব্যবহারে ক্রমেই মর্মাহত হ'তে লাগলাম।

তিনি সেবাধর্মের নামও আর করেন না। ট্রামে উঠলে তাঁর মতো স্বার্থপর আর দেখা যায় না। ভীড়ের মধ্যে সীট থেকে কেউ উঠে গেলে সেই সীটের কাছের লোকের দাবী অগ্রাহ্য ক'রে তাদের ঠেলে বিদ্যুৎ গতিতে গিয়ে সেই খালি আসন দখল করেন। শুধু তাই নয়, যার পাশে বসেছেন তাকে হাঁটু দিয়ে ঠেলে রাখতে চেষ্টা করেন। পাশের লোকও তাকে ঠেলতে চেষ্টা করে। তখন দুজনে রীতিমতো ঝগড়া লেগে যায়।

ক'দিন পরে আরও একটি খবর শুনে স্তম্ভিত হ'য়ে গেলাম। আমাদেরই সেবকদলের একজন এসে বলল, রেভারেণ্ড কিং বস্তীতে গিয়ে, সেখানকার লোকদের কাছে এতদিন যে ওষুধ এবং পথ্য দেওয়া হয়েছে, তার জন্যে নাকি কিছু কিছু টাকা আদায় করছেন। বস্তীর লোকেরা প্রায় ক্ষেপে গেছে। বলছে, আগে জানলে তারা ওষুধপত্র কিছুই নিত না।

আমাদের এক বন্ধু একদিন এসে বললেন, এ সব কি শুনছি?

কি?

রেভারেণ্ড কিং-এর নামে নানা রকম কুৎসা রটাচ্ছে সবাই।

তুমি কি শুনেছ?

শুনেছি যা, তা শুনলে কেউ বিশ্বাস করবে না।

এখন আর পৃথিবীতে অবিশ্বাস করবার কিছুই নেই, তুমি নির্ভয়ে বল।

বন্ধু বলতে লাগলেন, রেভারেণ্ড কিং-এর নীচের তলার ভাড়াটেদের সঙ্গে তাঁর ভয়ানক ঝগড়া চলছে। তিনি তাদের উঠে যাবার জন্যে নোটিস্ দিয়েছেন।

কেন?

কেন বুঝলে না? পনেরো টাকা ভাড়া পাচ্ছিলেন, কিন্তু ও বাড়ির ভাড়া

এখন বেশি টাকা সহজেই পাওয়া যাবে। যারা আছে তাদের কাছ থেকে তো আর বেশি ভাড়া নিতে পাচ্ছেন না, চক্ষু লজ্জাতেও আটকায় আইনেও আটকায়। তাই ওদের তুলে দিতে পারলে নতুন ভাড়াটে পাওয়া যাবে বেশি টাকায়।

যারা আছে তারা যদি না ওঠে?

উনি নিজের জন্যেই নীচের তলাটা চান, এইভাবে নোটিস্ দিয়েছেন। কিন্তু যারা আছে তারা নতুন বাড়ি না পেলে উঠে যেতে পারছে না। রেভারেণ্ড কিং তাদের নানাভাবে অসুবিধায় ফেলছেন সে জন্যে। উপর থেকে জল ঢালছেন, সে জল তাদের ঘরের মধ্যে পড়ছে। উপর থেকে জঞ্জাল ফেলছেন, সব উড়ে গিয়ে লাগছে তাদের গায়ে।

বল কি?

আমিও তো অবাক হচ্ছি এসব শুনে। আচ্ছা এর মানে কি বলতে পার? ভদ্রলোক হঠাৎ এমন ডিগবাজী খেলেন কেন?

কেন, সেই কথাই তো ভাবছি।

একথা শুনে আমি আর স্থির থাকতে পারলাম না। রেভারেণ্ডের কাছে গিয়ে বললাম, এ সব কি শুনছি?

তিনি বললেন, এতদিন ভবিষ্যতের কথা ভাবিনি, এখন ভাবতে হচ্ছে। ছোট-লোকেরা বিনা পয়সায় সব পেয়ে পেয়ে মাথায় চড়ে বসেছে। বেটারা এতদিন ওষুধ আর ভাল ভাল পথ্য খেয়েছে বিনা পয়সায়, এখন তার কিছু দাম দিক। ভিখারীর জাত বেটারা, ওদের আর প্রশ্রয় দেওয়া ঠিক নয়।

এর উত্তরে একটি কথাও আর বলতে প্রবৃত্তি হ'ল না। তাঁর আশা একেবারে ছেড়ে দিলাম। আমাদের সেবাসঙ্ঘও ভেঙে গেল। কিন্তু মনে যে আঘাত লাগল তা থেকে মুক্তি পেলাম না।

মাস খানেকের মধ্যেই দেখি রেভারেণ্ড কিং চালের ব্যবসা শুরু করেছেন এবং চোরা বাজারের পথে ইতিমধ্যেই বেশ কিছু টাকা ক'রে ফেলেছেন। চোরা বাজারের চাঁইরা রেভারেণ্ড কিং-এর নামে চমকে উঠে বলে, বাপ্! এর মতো ঘুঘু লোক আর দেখা যায় না। লোকটা এ বছরে কোটিপতি হবে।

আমার মনে কেবলই প্রশ্ন জাগতে লাগল, এর মানে কি? রেভারেণ্ড কিং কি এতদিন ভণ্ডামি করেছেন? সেবাধর্মের ছলে নিজের ব্যবসার পথ পরিষ্কার করেছেন এতদিন—না তাঁর হঠাৎ মাথা খারাপ হয়েছে?

যদি মাথা খারাপ হয়ে থাকে তা হ'লে আমাদের নিশ্চিন্ত থাকা চলে না।

মনোবিজ্ঞানের পণ্ডিতদের কাছে যাতায়াত করতে লাগলাম। কেউ ব'ললেন, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না; কেউ বললেন, বোমার 'শক্' পেয়ে ওঁর ভিতর থেকে দ্বিতীয় আর একটি ব্যক্তিত্ব জেগে উঠেছে। এবং এ রকম হওয়া যে অসম্ভব নয়, তা তাঁরা বহু নজির দেখিয়ে বুঝিয়ে দিলেন। আমার বন্ধুরা এই কথা সহজেই মেনে নিশ্চিন্ত হলেন। কিন্তু তবু আমার মনে কিছু সন্দেহ থেকেই গেল। এমন মহৎ লোকের 'দ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব' এমন ছোটলোক হয় কি ক'রে এ প্রশ্নের উত্তর আমি পেলাম না। সবটাই একটা অলৌকিক ব্যাপার ব'লে বোধ হ'তে লাগল।

এমন সময় শোনা গেল, বিলেত থেকে ডক্টর স্টীন্ নামক এক প্রসিদ্ধ প্যাথলজিস্ট বিশেষ একটা কাজে বোম্বাইতে এসেছেন।

অবশেষে মানসিক অশান্তি দূর করার জন্যে আমাকে বোম্বাই পর্যন্তই যেতে হ'ল। এতখানি উৎসাহের জন্যে, এবং আমি 'দ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব' থিওরিটি কেন মানতে পারছি না, এ জন্যে বন্ধুরা বিদ্রূপ করতে লাগল।

বোম্বাইতে গিয়ে ডক্টর স্টীনের সঙ্গে দেখা করলাম। ডক্টর স্টীন সদাশয় লোক, তাঁর সঙ্গে আমার অনেকক্ষণ আলোচনা হ'ল। তিনি খুব মনোযোগ দিয়ে আমার কাহিনী শুনলেন। শুনতে শুনতে তিনি বহু প্রশ্ন আমাকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। আমি প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি তাঁকে বললাম। তা ছাড়া বাঙালীর চরিত্র সম্বন্ধেও তিনি অনেক তথ্য আমার কাছ থেকে জেনে নিলেন।

তিনি আগাগোড়া সব শুনে হেসে বললেন, এ রকম কেস্ আমার একেবারে অজানা নয়। বিলেতেও এ রকম একটা ঘটনা আমি দেখেছি। 'শক' চিকিৎসার সময় যে সিরাম ইনজেকশন দেওয়া হয়েছিল, সেটা বাঙালীর রক্তের সিরাম। সেই ইনজেকশনের পর থেকেই রেভারেণ্ড কিং-এর চরিত্রে বাঙালীর বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। তার প্রথম লক্ষণ আপনি বলছেন, ট্রামে ব'সে পাশের যাত্রীকে হাঁটু দিয়ে ঠেলে দেওয়ার চেষ্টা। তা নয়। এটা একটা প্রধান লক্ষণ হ'লেও এর আগেই লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে। প্রথম লক্ষণ ফুটেছে রেভারেণ্ডের কথায়। তিনি বলেছেন, "ঘরের খেয়ে আর বনের মোষ তাড়াতে ইচ্ছা করে না।"

ভেবে দেখলাম ডক্টর স্টীনের কথাই ঠিক। এ ছাড়া একটা মহৎ লোকের পরিবর্তন আর কিছুতে হওয়া সম্ভব নয়।

রূপান্তর

রেভারেণ্ডের উপর মনে যে ঘৃণা জেগেছিল, তা এবারে সম্পূর্ণ দূর হ'য়ে গেল, তাঁর জন্যে বড় দুঃখ হ'তে লাগল।

জিজ্ঞাসা করলাম, এর কি কোনো প্রতিকার নেই?

না, কোনো প্রতিকার নেই।

সিয়ামের জাতিভেদে কি সবারই এই রকম হয়?

না। লাখে এক জনের হয় কি না সন্দেহ। বিলেতেও মাত্র একটি কেসের রেকর্ড আছে, এবং কালক্রমে কাহিনীটি কৌতুক গল্পে পরিণত হয়েছে।

ডক্টর স্টীন বলতে লাগলেন, একবার এক ইংরেজের দেহে রক্ত ইনজেক্ট করার দরকার হয়েছিল, সেজন্যে রক্ত দাতাকে তিনি উপযুক্ত ফী দিতে রাজী ছিলেন। কিন্তু তাঁর দেহে রক্ত প্রবেশ করানোর পর তিনি ফী দিতে অস্বীকার করলেন, দিলেন শুধু ধন্যবাদ। কারণ রক্তদাতা ছিলেন কৃপণতায় প্রসিদ্ধ স্কটল্যাণ্ডবাসী, সুতরাং কৃপণের রক্ত ইংরেজের দেহে গিয়ে ইংরেজকে কৃপণ ক'রে তুলল, তাঁর কাছ থেকে আর টাকা আদায় করা গেল না। রেভারেণ্ড কিংও এইভাবেই বাঙালীর চরিত্র লাভ করেছেন।

বিষণ্ণ মনে বোম্বাই থেকে ফিরে এসে রেভারেণ্ডের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। গিয়ে দেখি চালের বাজার নিয়ে কয়েকজন মক্কেলের সঙ্গে তিনি গোপন আলাপ করছেন। আমাকে দেখেই চুপ ক'রে গেলেন, আমার সঙ্গে কোনো কথাই বললেন না।

ফিরে এলাম। ভাবলাম ভবিষ্যৎ শুধু রেভারেণ্ড কিং-এরই নেই, আমারও আছে। তাঁর উপর খুবই অভিমান হ'ল।

কিন্তু যতই দিন যেতে লাগল, ততই বুঝতে পারলাম আমি অত্যন্ত নির্বোধের কাজ করেছি। রেভারেণ্ড কিং-এর মতো টাকা এবং প্রতিষ্ঠাওয়ালা লোকের সঙ্গে আমি করছি বিবাদ। এতে আমার লাভ কি? ছাত্রজীবনের একটা মূল্যহীন আদর্শ আমাকে কি দিতে পারে? আমি নির্বুদ্ধিতাবশত তাঁর মতো একজন সহায়কে পরিত্যাগ ক'রে একা ঘরে বসে জ্বলেপুড়ে মরছি। কিসের জন্যে? না, রেভারেণ্ড কিং ব্যবসা করছেন এই জন্যে। অথচ তাঁর সঙ্গে থাকলে আমি অনায়াসেই আমার অবস্থা ফিরিয়ে ফেলতে পারি। অতএব কেন তাঁর সঙ্গে যোগ দেব না? কেন তাঁকে শ্রদ্ধা করব না? কেন তাঁর পায়ে আমার মাথা নত করব না? কেন তাঁর গুণগান করব না?

পরম অনুতপ্ত হয়ে বিনীতভাবে তাঁর কাছে গিয়ে এক দিন আমার নিবেদন জানালাম।

রেভারেণ্ড কিং আমার প্রস্তাব শুনে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে আমাকে প্রায় জড়িয়ে ধরলেন এবং বললেন এ তো অতি উত্তম কথা, আপনাকে আমি অংশীদার ক'রে নেব।

এর পর এক বছর কেটে গেছে। আমি আজও তাঁর অংশীদার হ'তে পারিনি। তিনি এই এক বছর ধ'রে আমাকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন আর ঘোরাচ্ছেন। বলছেন, এই র‍্যাশন পদ্ধতিটি উঠে গেলেই তিনি আমাকে নিয়ে নেবেন, কেননা এখন নাকি কিছুই লাভ হচ্ছে না।

(শারদশ্রী, ১৯৪৪)



পা শা পা শি

ট্রেনে দুই জন পাশাপাশি বসেছে, কিন্তু নিতান্তই দৈববশত একজন ধনী, একজন সাধারণ লোক; দুজনেই ইন্টার ক্লাসের যাত্রী। সাধারণ লোকটি নিতান্তই সাধারণ নয়, তাকে দেখলেই বোঝা যায় সে যেন জোর ক'রে ভদ্রলোক সেজেছে। মুখ কর্কশ এবং কালো, চোখ দুটি লাল, প্রচুর পান খেয়ে দাঁতগুলো প্রায় কালো হয়ে এসেছে, এবং ক্রমাগত বিড়ি টানছে। কিন্তু গায়ের শার্ট এবং পরনের লুঙিটি সিল্কের এবং রংবেরঙের। কানের ভিতরে আতর মাখানো খানিকটা তুলো গোঁজা, পায়ে পেটেন্ট লেদারের পাম্পশু।

ধনী ভদ্রলোকটি ঠিক তার বিপরীত। সে পোশাকে পরিচ্ছদে চেহারায় ঐশ্বর্যের পরিচয় বহন করছে। ডান হাতে চারটি আঙুলে চারটি আংটি এবং প্রত্যেকটিতে দামী পাথর বসানো। গায়ে দামী সিল্কের পাঞ্জাবী, পরনে মিহি তাঁতের কাপড়, পায়ে দামী ইংলিশ শু এবং হাতে ইংরেজী খবরের কাগজ। সমস্ত মনোযোগ কাগজে নিবদ্ধ।

ধনী ভদ্রলোকটির নাম দুর্লভচন্দ্র দত্ত, লুঙিপরা লোকটির নাম করিম। নামেই চেনা উচিত একজন বিখ্যাত ব্যবসায়ী, আর একজন বিখ্যাত পকেট-মার।

ট্রেন ছাড়তে কিছু বিলম্ব আছে। প্ল্যাটফর্মে যাত্রীর ভীড়, ফেরিওয়ালার ভীড় এবং ভিখারীর ভীড়।

দুর্লভচন্দ্রের চেহারা দেখে খুব আশান্বিতভাবে এক বৃদ্ধ ভিখারী এসে হাত বাড়ালো। দুর্লভচন্দ্র ভিখারী দেখে উত্তেজিত হয়ে উঠল।

"যত সব ছোঁচোর ভিক্ষার ব্যবসা চালাচ্ছে, যাও, ভাগো, ভাগো" ব'লে সে গর্জন ক'রে উঠল, ভিখারীটা কাতরভাবে তার দিকে চেয়ে রইল।

লুঙিপরা বলল, "আহা চটেন কেন মশাই, গরীব লোক, পয়সা না দেন তো গাল দেন কেন?"

"গাল দেবে না, পূজো করবে—যত সব ছোট লোক!" বলে দুর্লভচন্দ্র পুনরায় খবরের কাগজে শেয়ার মার্কেটের রিপোর্টের কলমে মন দিল।

করিম ভিখারীটাকে "এই বুড্ঢা এই নে" ব'লে তার হাতে একটা সিকি দিল। বৃদ্ধ কৃতজ্ঞতায় উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ব'লে উঠল, "আহা ভগবান তোমার ভাল করবেন বাবা।"

করিমের এই ব্যবহার দেখে অন্য যাত্রীরা সবিস্ময়ে তার দিকে চেয়ে রইল। যারা মনে করেছিল লোকটি একটি গুণ্ডা, তাদের চোখে করিমের চেহারা যেন মুহূর্তে বদলে গেল। তারা মনে মনে বুঝতে পারল এই লোকটাই আসলে ভদ্রলোক, আর ঐ হীরের আংটিপরা লোকটি একটি চামার বিশেষ।

দুর্লভচন্দ্র বড়ই অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। এমন সময় তার মাথার উপরের বাঙ্ক থেকে আর এক সোনার বোতাম এবং সোনার হাত ঘড়ি পরা ভদ্রলোক বলে উঠলেন, "মশাই বৃথা ভাবছেন। আজকাল সূর্য পশ্চিমে উদয় হচ্ছেন; দুনিয়া উল্টে গেছে; ঢোক গিলে যান।"

"তা যা বলেছেন।"

এই সংক্ষিপ্ত উত্তরটি দিয়ে দুর্লভচন্দ্র ঢোকই গিলল, আর কিছু বলল না।

মেল ট্রেন, দীর্ঘপথযাত্রী সবাই। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। ট্রেন ছুটে চলেছে নক্ষত্র বেগে। ক্রমে ট্রেনের বাইরের পৃথিবীও ট্রেনের ভিতরের মতোই অন্ধকার হ'য়ে এল। যাত্রীরা সবাই তন্দ্রাচ্ছন্ন হ'য়ে পড়ছে, মাঝে মাঝে জাগছে, অন্ধকারেই আলাপ করছে, আবার ঘুমিয়ে পড়ছে। ব'সে ব'সে ভাবেই সবার ঘুমোতে হবে, উপায় নেই।

দুর্লভচন্দ্র কিন্তু নিদ্রাহীন। সে বসে বসে একটার পর একটা সিগারেট খেয়ে চলেছে। আর জেগে আছে বাঙ্কের উপরের সেই ভদ্রলোকটি—তার চোখেও ঘুম নেই।

ট্রেন একটা বড় স্টেশনে এসে থামল। আবার যাত্রীর কলরব, আরার ওঠানামা, দুর্লভচন্দ্র নির্বিকারভাবে বসে বসে সিগারেট টানছে। প্ল্যাটফর্মের আলোয় গাড়ির ভিতরটা কিছু আলোকিত হয়েছিল, করিম দেখতে পেল দুর্লভচন্দ্রের সোনার সিগারেট কেস্‌টি। ক্ষীণ আলোর প্রতিফলনেও কেস্‌টি যেন স্বর্ণের মতো জ্বলে উঠল। করিমের মনে যেন ক্ষণকালের জন্যে নেশা ধরল, কিন্তু সে প্রাণপণ শক্তিতে মনটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে নেবার জন্যে নেমে-যাওয়া যাত্রীদলকে সাহায্য করতে লাগল। হঠাৎ যেন সে নিজেকে ভুলে গিয়েছিল।

দরজা খোলা পেয়ে নতুন একদল যাত্রী সেই গাড়িতে উঠতে যাচ্ছে দেখে দুর্লভচন্দ্রের ধ্যানভঙ্গ হ'ল। সে লাফিয়ে উঠে প্রবেশকামী যাত্রীদের প্রাণপণে বাধা দিতে লাগল আর চেঁচিয়ে বলতে লাগল, "এ গাড়িতে জায়গা নেই—পিছনের গাড়িতে যাও।"

করিম দুর্লভচন্দ্রকে ঠেলে দিয়ে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল এবং যাত্রীদের বলতে লাগল, "উঠে আসুন আপনারা।" দুর্লভচন্দ্রকে বলল, "কেন উঠতে দেবেন না মশাই? গাড়ি আপনারও নয়, ওদেরও নয়, তবে আর কেন হল্লা করছেন?"

করিমের পেশীবহুল হাতের দিকে চেয়ে দুর্লভচন্দ্র প্রতিবাদ করতে সাহস করল না, আস্তে আস্তে আসনে ব'সে বিড় বিড় ক'রে বলতে লাগল, "ইস্ বড্ড যে দয়া দেখা যাচ্ছে—এখন ঠেলাটা সামলাও।" উপরের ভদ্রলোক চাদরের নীচে থেকে মুখ বাড়িয়ে বললেন, "ঢোঁক গিলে যান মশাই, সূর্য এখন পশ্চিম থেকে উঠছেন।"

গাড়ির মধ্যে এতগুলো নতুন যাত্রী আসাতে সকলেই বিপন্ন বোধ করল, উঠলো এসে একটা গোটা পরিবার, ছোট ছোট ছেলেমেয়েসুদ্ধ।

করিম শুধু বলতে লাগল, "কেন হবে না, হয়ে যাবে, ঠিক হয়ে যাবে। বিপদে পড়েছেন ভদ্রলোকরা, তাই ব'লে তো তাড়িয়ে দেওয়া যায় না, অসুবিধা সকলে-

হয়—ঘরে বসে থাকলেই হয়, কেন বাবু গাড়িতে চড়ার হাঙ্গামা ?" এবং সঙ্গে সঙ্গে জিনিসপত্র ঠেলে ঠুলে সবার জায়গা ক'রে দিতে লাগল।

অবস্থাটা মেনে নিয়ে সবাই শেষ পর্যন্ত চুপ ক'রে গেল।

গাড়ি রাত্রির অন্ধকার ভেদ ক'রে ছুটে চলল, যেন একটা সুদীর্ঘ অন্ধকারের 'টানেল'; পার হয়ে গেলেই আলোয় মুক্তি।

সবাই যে যেমন অবস্থায় আছে ঘুমে ঢুলছে। দু' ঘণ্টার মধ্যে গাড়ি আর কোথায়ও থামবে না। রাত্রি প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে।

দু' ঘণ্টাও পার হ'য়ে গেল।

পরবর্তী স্টেশন থেকে গাড়ি যখন ছাড়বে তখন হঠাৎ দু' একজন যাত্রী আবিষ্কার করল তাদের বহু জিনিষপত্র চুরি হ'য়ে গেছে।

চীৎকারে সবাই জেগে উঠে দেখে যার যা কিছু দামী জিনিষ ছিল কিছুই নেই। করিমের ব্যাগটিও নেই।

আর নেই ভুলুবাবু, আর বাঙ্কে শোয়া সেই ভদ্রলোকটি।

অদ্ভুত সে দৃশ্য! যুদ্ধের বাজারে ব্ল্যাক মার্কেটের জোচ্চুরিতে হাত পাকিয়ে শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা চুরি করে পালিয়েছে, আর যুদ্ধের কাজে নিযুক্ত ভূতপূর্ব্ব পকেট-মার ভদ্রলোক হয়ে হায় হায় করছে।

(সচিত্র ভারত ১৯৪৪)



নবকুমারের উপন্যাস

অনেক ভেবে চিন্তে নবকুমার তার উপন্যাসের ভূমিকাটা এইভাবেই শুরু করল :

"স্বর্গরাজ্য থেকে শয়তান এবং তার অনুচরবৃন্দ বিতাড়িত হয়েছে।...

"জ্বলন্ত হ্রদে শয়তানের প্রথম জাগরণ হ'ল। মানতে হ'ল তার এই হীন নির্বাসন। কিন্তু তার উদ্ধত শির নত হ'ল না, সে বলল— নরকই আমার স্বর্গ, কেননা স্বর্গ আর নরক মনেরই সৃষ্টি, মনের বাইরে ওদের কোনো সত্তা নেই।...আর যাই হোক এখানে আমরা স্বাধীন।

"তৈরি হ'ল প্যাণ্ডিমোনিয়াম্। সভা বসল সেখানে। আলোচনা চলল—ঈশ্বরের নবনির্মিত জগৎকে ধ্বংস করতে হবে, অথবা দখল করতে হবে, অথবা সেখানকার বাসিন্দাদের দলে টানতে হবে। যেমন ক'রে হোক প্রতিশোধ নিতে হবে।

"তারপর বহু ঘটনার ভিতর দিয়ে শয়তানের পরিকল্পনা রূপ গ্রহণ করতে লাগল।

"তারপর এল ইডেনের দৃশ্য। আদম আর ঈভ—পরম সুখে দিন কাটাচ্ছে। কিন্তু শয়তানের ষড়যন্ত্র নিষ্ফল হবে না।

র‍্যাফেল প্রেরিত হ'লেন স্বর্গ থেকে, আদমকে সাবধান করতে; আদমের পতন অনিবার্য, কিন্তু তার আগে সে জানুক তার কি হবে, সে সজ্ঞানে নিজের ভাগ্য গড়ে তুলুক।

"তারপর এল চরম মুহূর্ত। সেদিন ঈভেরই দোষে আদম আর ঈভ পরস্পর পৃথক ভাবে কাজে গেল। শয়তানের শুভ সুযোগ। সে সাপের মূর্তি ধরল। ঈভ একা—তাকে প্রবঞ্চনা ছলে ভুলিয়ে নিষিদ্ধ ফল খেতে বাধ্য করল। ঈভ ডুবল, আদমকেও ডোবাল।"

এর পর থেকে শুরু হয়েছে নবকুমারের নিজের কাহিনী। সেই কাহিনীর সঙ্গে এই ভূমিকার অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। উপন্যাস যতই এগিয়ে গেছে ততই এই ভূমিকাটির সার্থকতা বেশি করে ফুটে উঠেছে। নবকুমারের উপন্যাসখানি এই ভূমিকাযোগে নবতর বৈশিষ্ট্য লাভ করেছে।

মাসিকপত্র সম্পাদকের ঘর।

ঈশ্বরের বিচার শেষ হয়েছে; সম্পাদকের বিচার শুরু হবে।

নবকুমারের প্রথম উপন্যাস। কত বিনিদ্র রজনীর স্মৃতিভরা, কত আশা-আনন্দের স্পর্শমাখা এর প্রতিটি পৃষ্ঠা। আজ সে দ্বিধা-কম্পিত হৃদয়ে এসেছে সম্পাদকের দ্বারে। তার ইচ্ছা উপন্যাসখানি মাসে মাসে ছাপা হয়।

সম্পাদক আগ্রহের সঙ্গে শুনতে রাজি হয়েছেন। অল্প খরচে মাসিক চালানোর উপর তাঁরও চাকরি নির্ভর করছে। নবকুমার বিনা পয়সায় উপন্যাস দেবে; উপন্যাস শোনার পক্ষে একটা মস্ত বড় তাগিদ। কি জানি যদি ভাল লেখাটাই হাতছাড়া হয়ে যায়।

খুব উৎসাহের সঙ্গেই নবকুমার পড়তে আরম্ভ করল। কণ্ঠে তার আবেগ,

উচ্চারণ স্পষ্ট এবং মধুর। ভূমিকা শেষে আসল কাহিনীর আরম্ভ। পাতা ওল্টাবার আগেই সম্পাদক বললেন, থামুন!

নবকুমার চমকিত হল। সম্পাদকের ঐ কথাটি যেন একটা গুলির মতো তার বুকে এসে বিঁধল।

সম্পাদকের মনশ্চক্ষে ফুটে উঠল তাঁর মালিকের চেহারা। সেই দিনই তিনি অফিসে এসে বলে গেছেন, 'ভাল উপন্যাস সংগ্রহ কর সম্পাদক'। যুদ্ধের বাজারের উদ্বৃত্ত লাভে জন্ম নিয়েছে তাঁর কাগজ। মূল্যহীন লেখা তাঁর কাগজে স্থান পেয়ে, মূল্যবান হয়ে উঠবে, মূল্যহীন লেখকেরা ধন্য হবে। লাভের কিছু অংশ এইভাবে তিনি ব্যয় করবেন দেশসেবায়।

নবকুমার অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। সম্পাদকের চেহারা, তাঁর বিনীত ব্যবহার এবং সহানুভূতিপূর্ণ ভাষায় এতক্ষণ সে যতখানি উৎসাহিত হয়েছিল, সে উৎসাহ ঐ একটি কথায় তার নিবে গেল। ঐ ছোট্ট মানুষটি দৈবক্রমে সম্পাদকীয় চেয়ারে বসেছে ব'লে সে কি তার এত যত্নের সৃষ্টিকে বিনা বিচারে মৃত্যুদণ্ড দেবার অধিকার পেয়েছে?···তবে কি বিচারবুদ্ধি তাঁর নেই? অথবা বিদেশী পৌরাণিক কাহিনী ব'লেই তাঁর আপত্তি?

কিন্তু 'থামুন' কথাটি তো খুব স্পষ্ট নয়। চিন্তারত সম্পাদকের মুখের দিকে চেয়ে নবকুমারের সন্দেহ হ'ল, তবে কি তিনি মনে করেছেন আমি প্যারাডাইস্ লস্টের গল্পটি চুরি ক'রে নিজের বলে চালাচ্ছি?

কিন্তু তার অমূলক সন্দেহ দূর ক'রে সম্পাদক বললেন, আপনার ভাষা ভাল, বর্ণনার ভঙ্গী চমৎকার, কিন্তু ভূমিকাটি—

নবকুমার উৎসাহের সঙ্গে বলল, ওরই মধ্যে আমার কাহিনীর ছায়া ভাসছে।

সম্পাদক আবার চিন্তানিবিষ্ট হ'লেন।

আচ্ছা, ভূমিকায় যেটুকু আপনি বলেছেন, মাত্র ঐ টুকুকেই কি একটা রূপক কল্পনা করা যায় না?

কেন যাবে না? ওটা আসলে তো রূপকই।

তা হ'লে ও-থেকে কি গল্পটির সম্পূর্ণ আভাস পাওয়া যাচ্ছে না? আপনি তো বলেছেন আপনার মূল গল্প ওতে প্রতিবিম্বিত হ'চ্ছে।

কিন্তু আভাসই পাওয়া যাচ্ছে, গল্পটা পাওয়া যাচ্ছে না। গল্প পেতে হ'লে সবটা পড়তে হবে।

সবটা পড়ার জন্যে নবকুমার উস্‌খুস্ করতে লাগল।

কিন্তু লেখকেরা যখন বিগলিত, সম্পাদকেরা ঠিক সেই সময়েই প্রস্তরীভূত—সম্পাদকের চোখের সম্মুখে ফুটে উঠেছে তাঁর মালিকের ছবি!—'ভাল উপন্যাস সংগ্রহ কর সম্পাদক'।

নবকুমার বললে, তা হ'লে পড়ে ফেলি সবটা?

সম্পাদক সে কথায় কান না দিয়ে বললেন, আমি এর রূপক অংশটি যদি এই ভাবে ভাঙি—

নবকুমার সাগ্রহে সম্পাদকের দিকে চাইল।

আধুনিক কালের কতকগুলো ঘটনার সঙ্গে যদি মেলাতে চেষ্টা করি?

নবকুমার শঙ্কিতভাবে বলল, কিন্তু আমার এ লেখাটাকে একটা চিরন্তন কালের সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেছি!

চিরন্তন কালের কোনো সত্য নেই, শুনুন আমি এর একটা অর্থ করছি।

নব কুমার নিরুপায় ভাবে চাইল সম্পাদকের দিকে।

সম্পাদক বলতে লাগলেন, আপনার ঐ শয়তানকে ধরা যাক ব্ল্যাক মার্কেটের মজুতদার। সে জোচ্চুরি ক'রে ব্যবসা করতে চায় ব'লে সমাজ থেকে বিতাড়িত হয়েছে। এসেছে সে ব্ল্যাক মার্কেটের আড়তে। এই আড়ৎ হচ্ছে আপনার প্যাণ্ডি-মোনিয়াম্।

এবারে নবকুমার পাথর হ'ল।

সম্পাদক বলতে লাগলেন, কিন্তু ব্ল্যাক মার্কেটে এসে তার কাজ সহজ হ'ল না। এখানে হোমরা-চোমরাদের দলে টানতে না পারলে সহজে কিছু করা যাবে না, তাই সে তার আসল রূপ ধরল—সাপের রূপ। সাপ সেজে সে গেল যথাস্থানে ঘুঁস দিতে। কত ছলনা-ভরা কথায় সে ভোলাল এক বড়কর্তাকে। ঈভকেই ধরা যাক এই বড়কর্তা কেননা যারা ভোলে তারা পুরুষ হ'লেও আসলে নারীধর্মই তাদের মধ্যে প্রবল। অথবা ঈভকে বড়কর্তার গৃহিণীও ধরা যেতে পারে।

নবকুমারের কপালের শিরা দপ দপ করছে, কান গরম হয়ে উঠেছে।

সম্পাদক মৃদু হেসে বললেন, এমন একটা অর্থ কি করা যায় না?

নবকুমার মনের ভাব যথাসাধ্য গোপন ক'রে সংক্ষেপে বলল, যায় বোধ হয়, কিন্তু তাতে লাভ কি?

লাভ কি?—আমিও ভাবছি লাভ কি। লাভ আছে।—একটা বিপর্যয় থেকে বাঁচার ইঙ্গিত আছে আমার এই ব্যাখ্যার মধ্যে। একটা গোটা সুবর্ণ যুগকে বাঁচিয়ে দেবার ভরসা পাচ্ছি এতে।

বললেন কি ! আমার গল্পের মধ্যে যে এতখানি জটিলতা আছে তা তো বুঝতে পারিনি। তা ছাড়া গল্পটাই তো এখনও পড়া হয়নি।

সম্পাদক বিচলিত ভাবে বলতে লাগলেন, গল্প নয়, গল্পের ভূমিকাটি মারাত্মক। আমার নিজের জীবন, আমার পরিবারিক জীবন, আর আমাদের দেশের একটা মহৎ সম্ভাবনাকে গলা টিপে মারার আয়োজন আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি আপনার ঐ ভূমিকার মধ্যে।

নবকুমার ভয়ে শিউরে উঠল। সে নেহাৎ খ্যাতির তাগিদে ইহা লিখেছে, লেখার সময় কার সর্বনাশ করছে মোটেই ভাবেনি, কিন্তু সম্পাদকের কথায় তার সব গোলমাল হয়ে গেল। কে জানে, তার অজ্ঞাতসারে হয় তো সে সত্যিই মারাত্মক কিছু লিখেছে। সে নির্বোধের মতো প্রশ্ন করল, আপনি ঠাট্টা করছেন না তো ?

ঠাট্টা !

সম্পাদক এই কথাটি আচম্বিতে এমন একটি অস্বাভাবিক সুরে উচ্চারণ করলেন যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। ঐ শব্দটির পরে গোটা পঁচিশেক বিস্ময় বোধক চিহ্ন এবং গোটা দশেক জিজ্ঞাসার চিহ্ন তাদেরই মাঝে মাঝে বসিয়ে দিলে খানিকটা আন্দাজ করা যাবে।

নবকুমার অপরাধীর মতো চুপ ক'রে বসে রইল।

সম্পাদক হয় তো নিজেকে ভুলে গিয়িছিলেন, বিষণ্ণ নবকুমারের দিকে চেয়ে তিনি নিজেকে সামলে নিলেন এবং সুর একটু নরম ক'রে জিজ্ঞাসা করলেন, এ লেখা আর কোথায়ও ছাপাবার চেষ্টা করেছেন ?

না।…কিন্তু…

ওটা রেখে যান, আমি ভাল ক'রে ভেবে অপনাকে জানাব।

সম্পাদকের পরিবর্তিত কণ্ঠস্বরে সে যেন সহসা একটা বিষম ফাঁড়া থেকে বেঁচে গেল।

নবকুমারের বিদায় নেবার সময় সম্পাদক তার কাছে নিজের বিচলিত ব্যবহারের জন্যে মার্জনা চাইলেন, বললেন, হঠাৎ কিছু কড়া কথা বলে ফেলেছি, কিন্তু আমাদের কথা মুখে না শুনে চিঠিতে শোনাই নিরাপদ, আমি আপনাকে চিঠি দিয়েই যা হয় জানাব।

নবকুমার পরদিনই একখানা চিঠি পেল, এবং ঐ সঙ্গে লেখাটাও। সম্পাদক লিখেছেন, "আমাদের সম্পাদকীয় সঙ্ঘ (এইটে সম্পাদকের মিছে কথা, কেননা কাগজের একমাত্র তিনিই সম্পাদক) দুঃখের সঙ্গে বিবেচনা করেন, আপনার উপন্যাসখানা আমাদের কাগজে প্রকাশ করা চলতে পারে না। আমি নিজে যে সন্দেহ করেছিলাম, আমাদের সম্পাদক-সঙ্ঘও সেই সন্দেহ করেছেন যে, আপনি শয়তানকে উপলক্ষ ক'রে আমাদের কাগজের মালিকের চরিত্র এঁকেছেন। হয় তো ঐটা আপনি সজ্ঞানে করেননি, কিন্তু আপনার রূপক ভাঙলে যা দাঁড়ায় তাতে আর সন্দেহের অবকাশ থাকে না। আপনি নবীন লেখক, আপনার প্রতি আমাদের সহানুভূতি আছে, তাই আপনাকে দুটো ভাল কথা বলি। আপনি যুদ্ধের বাজারে এ রকম কোনো মহাকাব্যের রূপক-এ কোনো কাহিনী দাঁড় করাবার চেষ্টা করবেন না, কারণ দিনকাল বড় খারাপ, এ সময়ে বিশেষ ক'রে শয়তানের চরিত্রের বিরুদ্ধে কোনো কিছুই লেখা আপনার পক্ষে নিরাপদ নয়। আপনার এই উপন্যাস প্রকাশ হ'লে শুধু আমাদের মালিক নন, আরও অনেকে ক্ষিপ্ত হবেন, কে কে হবেন তাও আমরা জানি। অকারণ বিপদ ডেকে আনবেন না। আমার একান্ত অনুরোধ, আপনার পাণ্ডুলিপি আপাতত আপনি বাক্সে বন্ধ ক'রে রাখুন, যুদ্ধের পরে খুলবেন। ইতিমধ্যে বেদান্তের পটভূমিতে যদি কোনো গল্প লিখতে পারেন চেষ্টা করুন, আমরা তা সানন্দে প্রকাশ করব।"

(পরিচয়, ১৯৪৪)



শ্যামবাজারের জয়

মাত্র এক আধ মিটারের ব্যবধান নিয়ে ঝগড়াটা আজ কয়েক বছর ধ'রে চলে আসছে।

সলিল আর অনিল দুই বিখ্যাত সাঁতারু—প্রতি বছর এদের প্রতিযোগিতা। প্রথম ছিল এক মাইলের পাল্লা, বাড়তে বাড়তে আজ পাঁচ বছরে পাঁচ মাইলের পাল্লায় এসে পৌঁছেছে। কিন্তু এদের মধ্যে কে যে শ্রেষ্ঠ তার অবিসংবাদিত মীমাংসা আজও হয়নি। তার কারণ প্রায় পালা ক'রে একবার সলিল, একবার অনিল জিতে আসছে এবং এ ভাবে চললে কোনো দিনই হয়তো সে মীমাংসা হবে না।

সলিল বালিগঞ্জের ছেলে, অনিল শ্যামবাজারের। দু'দলেরই প্রায় কুড়ি হাজার উৎসাহী লোক দু'জনের পৃষ্ঠপোষক। কাজেই উভয়ের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ সাঁতারু তার একটা ভাল রকম মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত কেউ কাউকে ছাড়ছে না। এবারে ষষ্ঠ বছরে তারই আয়োজন চলছে। বালিগঞ্জ এবং শ্যামবাজার উভয় দলই অশান্ত হ'য়ে আছে, এদের মধ্যে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা হওয়া দরকার।

ক্ষিতীশ ভট্ট শ্যামবাজারের উৎসাহীদের বলেছে, এবারে কোনো ত্রুটি রাখা হবে না—এবারে এমন কিছু করতে হবে যাতে বালিগঞ্জকে অন্ততঃ আধ মাইল দূরে ফেলে শ্যামবাজার এগিয়ে যেতে পারে।

সে আরও বলেছে যথেষ্ট খরচ করতে হবে এ জন্যে, শ্যামবাজারের শ্রেষ্ঠত্ব এবারে স্থায়ীভাবে প্রমাণ করতে হবে নইলে সাঁতার খেলার মধ্যে আর আমি নেই।

ক্ষিতীশ ভট্টের বুদ্ধিতে কি না হ'তে পারে? শ্যামবাজারের লোকেরা তার ক্ষমতায় এত বিশ্বাসী যে, তার মুখের ঐ কথাটি শুনেই সবাই মনে মনে ভাবতে লাগল এবারে বালিগঞ্জ ডুববে।

সমস্যা যতই জটিল হোক ক্ষিতীশ ভট্ট সহজে তার মীমাংসা করতে পারে। স্থূল দেহ, মাথাটি ছোট, চুল আরও ছোট, দেখে মনে হয় বাংলার আদুরে দুলাল, কিন্তু কাজে নামলে তার তুল্য সাহসী, কৌশলী এবং একগুঁয়ে আর কেউ থাকতে পারে বলে মনে হয় না।

এবারে অনিলকে স্থায়ীভাবে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ না করিয়ে সে ছাড়বে না এই তার প্রতিজ্ঞা।

ক্ষিতীশ ভট্ট কণ্ঠপ্রতি আট আনা ধার্য করেছে। যার কণ্ঠে যত বেশি জোর, যার চীৎকার আধ মাইল দূরের লোক শুনতে পারে এমনি লোক বেছে বেছে সে জোগাড় করেছে হাজারখানেক। পঞ্চাশখানা নৌকো ভাড়া করা হয়েছে তাদের জন্যে। তারা সাঁতারের সময় অনিলের সঙ্গে সঙ্গে থাকবে, অনিলকে তারা চীৎকার করে উৎসাহ দেবে, তাতে অনিলের মনে প্রতি মুহূর্তে নতুন উদ্দীপনা জাগবে, সে ছুটে চলবে টর্পিডোর মতো। আর তাতে গৌণ ফলও একটা লাভ হওয়ার সম্ভাবনা। অর্থাৎ অনিলের পক্ষে এত উৎসাহদাতার আবির্ভাবে সলিল মনে মনে জ্বলতে থাকবে, সে উত্তেজিত হয়ে উঠবে, আর ঐসঙ্গে তার হাত পা শিথিল হয়ে আসবে। হারবে সে নির্ঘাৎ।

খুব গোপনে এই সব প্ল্যান করা হ'ল। কিন্তু কথাটা গোপন রইল না। কেমন ক'রে বালিগঞ্জের কানে কথাটা গিয়ে পৌছল বালিগঞ্জের ক্যাপ্টেন শিশির হালদার বলে উঠল, তাই নাকি? আচ্ছা, আমরাও দেখে নেব এ বারে। আমরা চোরের উপর বাটপাড়ি করব।

উদ্দেশ্যটা মনোমত হ'লেও বালিগঞ্জের মুখে শ্যামবাজারী ভাষাটা সহকারী ক্যাপ্টেন তরুণকুমারের পছন্দ হ'ল না। সে কথাটা সংশোধন করে বলল···আমরা ডবল্ ক্রস করব। শ্যামবাজারকে ডোবাতেই হবে।

এবং কিভাবে ডোবাতে হবে তার পরামর্শ চলতে লাগল।

বালিগঞ্জ যে শ্যামবাজারের প্ল্যান সব জেনে ফেলেছে সে কথা শ্যামবাজারের কানে পৌছতে দেরি হ'ল না, এমন কি তারা পাল্টা যে সব প্ল্যান করবে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ খবর এসে গেল ক্ষিতীশ ভট্টের কাছে। শ্যামবাজারের গুপ্তচর সব নিজে কানে শুনে এসেছে। জানা গেছে বালিগঞ্জের দল দু'শো জয়ঢাক আর কুড়িখানা নৌকো বায়না করতে যাচ্ছে। এই কুড়িখানা নৌকো সলিলের পাশে থেকে তাকে উৎসাহ দেবে, আর তার শব্দে শ্যামবাজারের সকল কণ্ঠধ্বনিকে তারা ডুবিয়ে দেবে।

ক্ষিতীশ ভট্ট প্রমাদ গণল। জয়ঢাকের বাদ্যে মানুষের গলা সত্যিই যে ডুবে যাবে। এ অবস্থায় সাঁতারের জয় পরাজয়ের কোনো মানে হয়?

কেন?···শ্যামবাজারের সহকারী ক্যাপ্টেন নীলু ঘোষ নির্বোধের মতো প্রশ্ন করল;

ক্ষিতীশ ভট্ট বিরক্তভাবে বলল, এটুকু বুঝলে না? এক দিকে মানুষের চীৎকার আর এক দিকে জয়ঢাকের শব্দ···দর্শকেরা জয়ঢাককেই বেশি সম্মান দেবে। তা ছাড়া ওতে অনিলের মন দমে যাবে।

নীলু ঘোষ কথাটি বুঝতে পেরে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল, তাইতো!

ক্ষিতীশ ভট্ট জিজ্ঞাসা করল, হাতে আছে কত?

—শ'দুই টাকা হবে।

—ওতে কিছু হবে না।

—তাহ'লে উপায়?

—ভাবছি। ব'লে ক্ষিতিশ ভট্ট দু'হাতের উপর মাথার ভার ন্যস্ত করে মিনিট তিনেক বসে ভাবল। তারপর ধীরে ধীরে উঠে বলল, আমি একটু ঘুরে আসছি।

মাড়োয়ারী মহলে এদের সাঁতার নিয়ে বছরে বছরে বাজি. খেলা হয় বহু লক্ষ-

টাকার। ক্ষিতীশ ভট্ট গেল এক পরিচিত মাড়োয়ারী ধনীর কাছে। তার প্রস্তাবটা হ'ল ঃ

—হাজার পাঁচেক টাকা চাই।

—কেন ?

—ভিক্ষা চাই না, টাকায় টাকা উঠে আসবে, টাকা দশগুণ ফিরে আসবে।

—কিমন ক'রে হোবে সমঝিয়ে দিন।

ক্ষিতিশ ভট্ট তার প্ল্যানটা সব খুলে বলল। যে দু'শো জয়ঢাক বালিগঞ্জ বায়না করেছে তাদের আরও বেশি টাকা দিয়ে শ্যামবাজারের দিকে টেনে আনতে হবে। তা ছাড়া কলকাতা শহরে আর যত জয়ঢাক আছে তাদেরও বায়না করতে হবে।

—তাহ'লেই যে শ্যামবাজার জিতবে তার গ্যারান্টি কোন দিবে ?

—স্রেফ উৎসাহে শ্যামবাজার জিতে যাবে। আর এই উৎসাহের অভাবে বালিগঞ্জ হারবে। তোমাদের খেলায় আর 'চান্‌স'-এর প্রশ্ন থাকবে না—জিৎ তোমাদের নিশ্চিত হবে।

মাড়োয়ারী বুদ্ধিমান। সে বলল, না বাবু, ও হচ্ছে তোমাদের হার-জিত, আমাদের হার-জিত তো ওভাবে হোবে না। তোমরা ভাবছ জয়ঢাকে তোমরা জিতবে, বালিগঞ্জ জয়ঢাক বাজাতে পারবে না, জব্দ হোবে। কিন্তু যারা জলে ভাসবে তারা ঐ আওয়াজে ফুর্তি পাবে না।

—কিন্তু বালিগঞ্জ তো জয়ঢাক বাজাবেই।

—ওরা নিজেদের লোকসান করবে, তোমাদেরও লোকসান হোবে।

ক্ষিতীশ ভট্ট নিরাশ হয়ে ফিরে এল। মাড়োয়ারী ঘুঘু ব্যবসায়ী, ধরেছে ঠিক। সাঁতারুদের কি অবস্থা হবে তা এরা কেউ ভাবেনি। এরা কেবল উৎসাহী আর পৃষ্ঠপোষকদের জয়-পরাজয়ের কথাটাই ভাবছে।······

পরক্ষণেই ক্ষিতীশ ভট্টের মনে হ'ল, কিন্তু সেটাও তো কম কথা নয়। শহরের লাখ লাখ লোকের চোখের সম্মুখে বালিগঞ্জ কেবল জয়ঢাক বাজিয়ে জিতে যাবে, শ্যামবাজারের পক্ষে সে কি কম অপমান ?

ক্ষিতীশ ভট্ট দমল না। তার মাথায় আর এক কৌশলের উদয় হয়েছে। সে ফিরে এসে নিজেদের মধ্যে অতিরিক্ত চাঁদা তুলল হাজারখানেক টাকা। তারপর শ্যামবাজারের ড্রামাটিক ক্লাবের এক পরম উৎসাহী অভিনেতাকে স্মরণ করল। বয়স তার কুড়ি বাইশ, কিন্তু যুদ্ধের বাজারেও বেকার। থিয়েটারে অভিনয় করার শখ তার বহুদিনের। সৈন্য করবে মিথ্যা ভয়ে যুদ্ধের চাকরিতে ঢোকেনি এবং

সৈন্যের ভূমিকা অভিনয় করতে হবে ভয়ে ব্যবসাদারী থিয়েটারে ঢোকেনি। শৌখিন থিয়েটার পার্টিতে তার কিছু মর্যাদা আছে, কিন্তু সে নায়কের ভূমিকা চায়। পুজোয় শাজাহান হবে তাদের ক্লাবে, এবারে সে শাজাহান হবে এই তার ইচ্ছা। এ বিষয়ে ক্ষিতীশ ভট্টের কিছু হাত আছে। সুতরাং ক্ষিতীশ ভট্টের আদেশ সে পরম আনন্দের সঙ্গে পালন করতে প্রস্তুত।

তারই শিক্ষা মতো সে সফল অভিনয় করল গিয়ে মাঝিদের আড্ডায়। তাদের কাছে বলল, সে বালিগঞ্জ থেকে আসছে। সে বলতে এসেছে জয়ঢাক নিয়ে ঢাকীরা যখন নৌকোয় উঠবে তখন প্রত্যেক নৌকোয় একখানা ক'রে লাল নিশান ওড়াতে হবে। নিশান এখনও সব তৈরি হয় নি, নৌকো ছাড়ার সময় দেওয়া হবে।

এতে অভিনয়-নৈপুণ্যের বিশেষ কিছু দরকার ছিল না, কিন্তু মিথ্যা কথাটি অভিনয়ের পর্যায়ে পড়ে ব'লে অভিনেতাকেই এ কাজটি করতে হ'ল।

ক্ষিতীশ ভট্ট প্রয়োজন মতো লাল নিশান তৈরি ক'রে ফেলল। তাদের দলের প্রত্যেকের হাতেও একখানা ক'রে লাল নিশান থাকবে, সবগুলো নৌকোতেও থাকবে, এতে দর্শকেরা ভাববে জয়ঢাকও শ্যামবাজারের। বালিগঞ্জকে অন্তত একটা বিষয়েও জব্দ করা হবে এইটেই আপাতত তাদের লাভ মনে হ'ল।

প্রতিযোগিতার দিন এসে পড়েছে। গঙ্গার ধারে লক্ষ লক্ষ লোক দাঁড়িয়ে গেছে। ওপার থেকে যারা এ পারে আসতে পারেনি তারা ওপারেই দাঁড়িয়ে গেছে—ভাগ্যবানেরা অপেরা গ্লাস চোখে লাগিয়েছে। স্ত্রী-পুরুষ শিশু-বৃদ্ধ শহর এবং মফঃসলের বুক খালি ক'রে এসে দাঁড়িয়েছে নদীর ধারে। চিৎপুরের খাল থেকে উজান দিকে পাঁচ ছ' মাইলের মধ্যে তিল ধারণের জায়গা নেই। দশ পনেরো হাত দূরে দূরে খাবারের দোকান, পান-সিগারেটের দোকান ব'সে গেছে।

সাঁতারের সময় ঘনিয়ে আসছে। দুই ডাক্তার দুই সাঁতারুর দেহ পরীক্ষা ক'রে বললেন, কোয়াইট ফিট্।

বেলা সাতটার মধ্যে দু'পক্ষে প্রায় পাঁচ সের চর্বি ফুরিয়ে গেল। সলিল এবং অনিল যখন চর্বিলিপ্তদেহে জলের ধারে এসে দাঁড়াল তখন মনে হ'ল যেন দুটি মাটির মানুষ দু'টি জলের জন্তুতে পরিণত হয়েছে।

আটটা বাজতে আর মিনিট তিনেক দেরি, দুজনে জলে গিয়ে নামল। বাঁশী বাজলেই সাঁতার আরম্ভ হবে। সবাই সাঁতারুদের নিয়ে ব্যস্ত, কিন্তু ক্ষিতীশ ভট্ট ব্যস্ত আছে অন্য কাজে। তার ইঙ্গিতে, বালিগঞ্জের অলক্ষ্যে, তাদের জয়ঢাকের নৌকোগুলোয় লাল নিশান বিলি হয়ে গেল।

আকাশে এতক্ষণ বড় এক খণ্ড কালো মেঘ ছিল সূর্যকে ঢেকে, সে মেঘও ঠিক এই সময় সরে গেল, সূর্যের হাসি এসে ভেঙে পড়ল দুই সাঁতারুর উপর, জলের ঢেউগুলো ঝলমল ক'রে উঠল। রৌদ্রালোকে দর্শকের মুখ আরও উজ্জ্বল হ'ল, এমনি সময় নৌকো থেকে দ্রুততালে জয়ঢাক বেজে উঠল। সাঁতারের বাঁশীও বাজল একই সঙ্গে। দর্শকেদের হর্ষধ্বনি তরঙ্গায়িত হ'য়ে ছুটে চলল চিৎপুর খালের দিকে।

বালিগঞ্জের শিশিরকুমার এবং শ্যামবাজারের ক্ষিতীশ ভট্ট সদলবলে পৃথক নৌকোয় সাঁতারুদের সঙ্গে রওনা হ'ল।

বালিগঞ্জের নৌকো থেকে শিশিরকুমার হঠাৎ লক্ষ্য করল জয়ঢাকের নৌকো-গুলোয় লাল নিশান উড়ছে।

এ কি ক'রে সম্ভব হ'ল? লাল নিশান তো শ্যামবাজারের চিহ্ন! সে চেঁচিয়ে উঠল,—কে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে? নামাও, নামাও নৌকো থেকে লাল নিশান, নামাও। কিন্তু দশ লক্ষ লোকের হর্ষধ্বনি আর জয়ঢাকের বাজনায় সে চীৎকার কারো কানেই গেল না। শিশিরকুমার বৃথাই বলতে লাগল, এ নিশ্চয় শ্যাম-বাজারের জোচ্চুরি। আমরা কিছুতেই মানব না।

ক্ষিতীশ ভট্ট তার নৌকো থেকে চেঁচিয়ে কি বলল, তাও কেউ শুনতে পে'ল না।

এমন সময় এক অপ্রত্যাশিত কাণ্ড ঘটে গেল। লক্ষ লক্ষ নরনারী নদীর পাড় থেকে হঠাৎ চীৎকার ক'রে উঠল—ডুবল ডুবল।

এমন প্রবল চীৎকারে হঠাৎ বাজনা থেমে গেল, হঠাৎ যেন একটা প্রলয়কাণ্ড ঘটে গেল। 'ডুবল' 'ডুবল' চীৎকারের ঢেউ জনতার এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত প্রতিধ্বনিত হ'ল। যারা দূরে ছিল তারা কিছুই বুঝতে পারল না। শ্যামবাজারের উৎসাহীরা বলতে লাগল, নিশ্চয় বালিগঞ্জ ডুবছে, বালিগঞ্জের লোকেরা বলতে লাগল, ডুবছে শ্যামবাজার, আমরা আগেই জানি ওরা ডুববে।

তারপরেই আবার চীৎকারের আর একটা ঢেউ এসে সবার কানে কানে ধাক্কা মেরে গেল, দুজনেই ডুবছে।

একটা অসম্ভাবিত সর্বনাশ ঘটে গেল দশ মিনিটের মধ্যে। আকাশ থেকে যেন বজ্রাঘাত হ'ল।

সলিল আর অনিল পাশাপাশি এগিয়ে যাচ্ছিল। প্রথম পাঁচ মিনিট তারা বেশ

ভাবে ভাবেই চলছিল, কিন্তু অন্যান্য বছরের তুলনায় এবারে তাদের গতি ছিল মন্থর। দর্শকেরা মনে করেছিল প্রথমেই ওরা ক্লান্ত হ'তে চায় না, সেই জন্যেই ধীরে ধীরে যাচ্ছে। তারপর দেখা গেল সলিলের মাথাটা জেগে আছে, দেহটা জলের মধ্যে কয়েক ইঞ্চি ডুবে গেছে। তার কয়েক সেকেণ্ড পরে অনিলেরও পিঠ আর দেখা গেল না। তারপর ধীরে ধীরে ওদের মাথাও ডুবতে লাগল। তখন সবাই ভাবল ওরা প্রতিযোগিতা ক'রে দু'জনেই ডুব সাঁতার কাটছে। কিন্তু এক মিনিট, দু'মিনিট, তিন মিনিট কেটে গেল, তবু ওরা উঠল না।

দর্শকদের মধ্যে যারা 'রেস' খেলায় অভ্যস্ত তাদের কেউ কেউ প্রশ্ন করতে লাগল এবারে কি ওদের কিছু কিছু 'হ্যাণ্ডিক্যাপ' দেওয়া হয়েছে? কিন্তু তার উত্তর কেউ দিতে পারল না।

উৎসাহীদের মুখে আশঙ্কার ছায়া গাঢ় হ'য়ে এল, তারা উন্মাদের মতো পরস্পরকে প্রশ্ন করতে লাগল, কি হ'ল? এরা উঠছে না কেন? তারপর পাঁচ মিনিটের মধ্যেও যখন কারো মাথা দেখা গেল না, তখন অনেকে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল, তারা ডুবে ডুবে অনুসন্ধান করতে লাগল, কিন্তু তাদের কোনো পাত্তাই পাওয়া গেল না।

আকাশের সূর্য আবার কালো মেঘের আড়ালে অদৃশ্য হ'ল, চারিদিকে অন্ধকার ঘনিয়ে এল, প্রবল বৃষ্টি পড়তে লাগল। সবারই মুখে উৎকণ্ঠা, সবারই মুখে প্রশ্ন, কি হ'ল—কি হ'ল?

— গঙ্গার স্রোত তরতর বয়ে যাচ্ছে—তার অন্তরে সহস্র রকম রহস্য, সে রহস্য কে উদ্‌ঘাটন করবে?

সলিল এবং অনিল দু'জনেরই আত্মীয়েরা নদীর তীরে হায় হায় করতে লাগল। পুলিস দেখা দিল ঘটনাস্থলে। তারপর বহু চেষ্টা ক'রে ডুবুরীর সাহায্যে দু'টি অজ্ঞান দেহকে টেনে তোলা হ'ল জল থেকে, ডাক্তাররা বহু চেষ্টা করলেন তাদের বাঁচাতে, কিন্তু বাঁচানো গেল না।

দু'পক্ষের ক্যাপটেন এবং তাদের প্রধান অনুচরদের গ্রেফতার করা হ'ল। সবারই মনে সন্দেহ জাগল ঘটনা সহজ নয়, নিশ্চয় বিরুদ্ধপক্ষীয়েরা বিপক্ষের সাঁতারুকে বিষ খাইয়েছে।

আত্মীয়-স্বজনের অনিচ্ছাসত্ত্বেও দেহ দু'টি পুলিসের হেপাজতে গেল পোস্ট-মর্টেম পরীক্ষার জন্যে এবং তার ফল যা প্রকাশ হ'ল তা ইস্কুলের খবর থেকেও উত্তেজক।

সে দিন উৎকণ্ঠিত উৎকর্ণ জনসাধারণ এবং দেশী ও বিদেশী খবরের কাগজের রিপোর্টারগণ দীর্ঘকাল ধৈর্যের সঙ্গে মর্গে অপেক্ষা ক'রে শুনতে পেল :

—দুজনেরই পেটে সের দশেক ক'রে পাথর পাওয়া গেছে।

সবাই সবিস্ময়ে উচ্চারণ করল, পাথর !

—হ্যাঁ পাথর। এরা ১৯৪৪ সালের এই ক'মাসে যত ভাত খেয়েছে তার সঙ্গে প্রতিদিন অন্তত আড়াই তোলা ক'রে কাঁকর খেয়েছে। দশ সের আন্দাজ হ্যাণ্ডিকাপ নিয়ে কোনো সাঁতারুই মিনিট পাঁচেকের বেশি ভেসে থাকতে পারে না, এরা তো তবু আরও দু-এক মিনিট বেশি ভেসেছে !

কিন্তু ক্ষিতীশ ভট্ট হাজত থেকে বেরিয়ে এসেই প্রমাণ করল শ্যামবাজার জিতেছে, কেননা সলিলের মাথা ডুবে যাওয়ার পরেও অনিলের মাথা আরও তিন সেকেণ্ড বেশি ভেসে ছিল।

(যুগান্তর, পূজা, ১৯৪৪)



একটা অসম্ভব সত্য

রানাঘাট স্টেশন থেকে দার্জিলিং মেলে উঠলাম ভোর বেলায়। ওঠা দুঃসাধ্য, জায়গার নিতান্ত অভাব, কিন্তু এক রকম জোর ক'রেই উঠতে হ'ল।

ভীড়ের মধ্যে নতুন যাত্রী উঠলে সবাই বিরক্ত হয়, কিন্তু আমারি ভাগ্য প্রসন্ন ছিল, এক ভদ্রলোক আমাকে ডেকে বললেন, "আসুন, কোনো রকমে হ'য়ে যাবে।"

নিজের অসুবিধা ক'রেও তিনি তাঁর পাশে কোনো রকমে আমাকে টেনে বসালেন। আমি কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁকে ধন্যবাদ দিতেই [illegible]

বললেন, "ধন্যবাদ পাবার মতো কিছু করিনি মশাই; এতে আমার তো আর কিছু অসুবিধা হ'ল না, পয়সাও খরচ হ'ল না কিছু।"

আমি বললাম, "মশাই, এটুকু ভদ্রতাও আজকাল বিরল।" ভদ্রলোক বললেন, "তা হবে। কিন্তু আমি যে-আশাভঙ্গের দুঃখ নিয়ে ট্রেনে ফিরছি তা যদি শোনেন, তা হ'লে বুঝতে পারবেন এ সব ছোটখাটো অসুবিধা আমার কাছে কিছুই না। শুনবেন আমার কাহিনী?"

"নিশ্চয় শুনব।"

ভদ্রলোক বলতে লাগলেন, "হিমালয়ের দৃশ্য দেখতে অনেকেই দার্জিলিঙে গিয়ে থাকেন, আমিও প্রতি বৎসর যাই। দার্জিলিঙ শহরটি বিশেষ কিছু না, কিন্তু সেখানকার এবং সেখানে যাবার পথের পাহাড়িয়া দৃশ্য আমার কাছে পরম উপভোগ্য। হিমালয় দেখলেই আমি যেন উন্মাদ হ'য়ে যাই, তার স্পর্শ আমার মনে আনন্দের ঢেউ তুলতে থাকে। সে যে কি ব্যাপার তা আমি কাউকে বোঝাতে পারব না, সে চেষ্টাও করব না। শুধু এইটুকু বিশ্বাস করুন, আমি না গিয়ে পারি না।

"এবারেও গিয়েছিলাম, কিন্তু ফেরার মুখে দেখি তিনধরিয়া থেকে শিলিগুড়ির মধ্যেকার পথে যে উন্মাদ করা পর্বতদৃশ্য ছিল তা কোথায় মন্ত্রবলে অদৃশ্য হয়েছে!

"আপনি মনে করতে পারেন এর সঙ্গে বয়সের সম্পর্ক আছে, চিরদিন একই জিনিস একই রকম ভাল লাগে না, বয়সের সঙ্গে দৃষ্টিও বদলায়। কিন্তু তা নয়। আমার বয়স গত ত্রিশ বছরে কিছুই বাড়েনি, দৃষ্টিশক্তিও একই রকম আছে। ভাল-লাগার মর্মকথা বোঝাতে আদৌ আমি কিছু বলছি না। আমি বলছি একটি অসম্ভব সত্য কথা, যা শুনলে বিশ্বাস করা দূরের কথা, দেখলেও বিশ্বাস হবে কি না সন্দেহ।

"মশাই আমি আবার বলছি, দার্জিলিঙ-হিমালয়ান রেলপথের তিনধরিয়া থেকে শিলিগুড়ি পর্যন্ত যতগুলো পাহাড় ছিল—এখন তার একটিও নেই।"

"অসম্ভব কথা! পুকুর চুরির কথা শোনা যায়, কিন্তু পাহাড় চুরির কথা আজ পর্যন্ত কেউ শোনেনি, কিন্তু অসম্ভব সম্ভব হয়েছে।

"ব্যবসায়ের বাজারে ধুলো সোনার দামে বিক্রি হয়, সোনা ধুলোর দামে বিক্রি হয়, রাজা ভিখারী হয়, ভিখারী রাজা হয়—একথা সবারই জানা আছে। ব্যবসায়ের মধ্যেও শ্রেণীবিভাগ আছে। ক্রোরোটাতে ব্যবসায়ী চিরকাল শতকরা পাঁচ

টাকা লাভে খুশী থাকে, আবার কোনোটাতে শতকরা পাঁচশ' টাকাতেও সে খুশী নয়—এ কথাও সবার জানা।

"কিন্তু কে জানত পাথরের এমন দাম হবে যে পাহাড়সুদ্ধ বিক্রি হ'য়ে যাবে! তাও আবার হিমালয় পাহাড়!

"যুদ্ধের সময় দেশের দুর্দশার সুযোগ নিয়ে অনেক লোভী ব্যবসায়ী কোটিপতি হয়েছে। দেশের লোকের অন্ন মেরে তারা ধনী হ'য়েছে, তাদের অনেকে বর্তমানে জেলে বাস করছে। কিংবা জরিমানা দিয়ে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করছে, কিন্তু সবাই নয়—কেউ কেউ আইন এড়িয়ে গেছে কৌশলে। চালের ব্যবসায়ে যে এমন প্রচণ্ড মুনাফা হ'তে পারে তা এদেশের লোকেও কখনও কল্পনা করতে পারেনি।"

এই পর্যন্ত ব'লে ভদ্রলোক হঠাৎ আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "বিস্ফোরক কিসে তৈরি হয় জানেন?—ডাইনামাইট?"

আমি বললাম, "নাম শুনেছি, কিন্তু কিসে তৈরি হয় জানি না তো।"

ভদ্রলোক বললেন, "দুটো আপাত-নিরীহ রাসায়নিকের সংযোগে তৈরি হয় মারাত্মক ডাইনামাইট।"

আমি প্রশ্ন করলাম, "ডাইনামাইট দিয়েই কি পাহাড়গুলো উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে?"

ভদ্রলোক বললেন, "প্রায় ধরেছেন, তবে নোবেল সাহেবের আবিষ্কৃত ডাইনামাইট নয়। দু'জন আপাত-নিরীহ লোক মিলে এই কাণ্ড ঘটিয়েছে: একজন বাঙালী, আর একজন মাড়োয়ারী।"

কথাটা হাসির, কিন্তু ভদ্রলোক বললেন, "না, হাসবেন না, আমি ঠিকই বলছি। এই দুই প্রদেশের লোককে কখনও একসঙ্গে মিলতে দেবেন না। ওদের যোগে যে শক্তির সৃষ্টি হয় তা ডাইনামাইটের চেয়েও মারাত্মক। শুনুন কি ব্যাপার। দেশে চালের অভাব হয়েছে শুনেছেন, বিশ্বাস করেন পুরোপুরি?"

"বিশ্বাস না ক'রে উপায় কি?"

"চালের অভাব ঘটেছে ঠিকই, কিন্তু পুরোপুরি নয়। টাকা দিলে চাল পাওয়া যায়। ত্রিশ টাকার বদলে চল্লিশ, চল্লিশের বদলে পঞ্চাশ দিন—চালের আড়ৎ খুলতে পারবেন বাড়িতে! মশাই জোচ্চোরেরা ফেঁপে উঠল। দেশের লোকেরা সব পশুর মতো মারা যাচ্ছে না-খেয়ে, কিন্তু জোচ্চোরেরা মুনাফার পর মুনাফা বৃদ্ধি ক'রে চলেছে। এরা সব খুনে', এদের ফাঁসি দেওয়া উচিত।...এরা ... যে

দাম চড়িয়ে লাভ করছে তাই নয়, চালের সঙ্গে কাঁকর মিশিয়ে লাভের উপর লাভ করছে। একমণ চালে দশ সের কাঁকর, কল্পনা করুন কি ব্যাপার।"

অবাক হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "এত? শতকরা পঁচিশ ফাঁকি?"

"একেবারে ফাঁকি। কিন্তু জোচ্চোরেরা একটু মুস্কিলে পড়েছে। তারা হাজার হাজার মণ কাঁকর নিয়মিত জোগাড় করতে পারছে না। তাই পাহাড় কিনতে হয়েছে হিমালয় থেকে। আর, এক মাসের মধ্যে দশটা মাঝারি পাহাড় লোপাট হ'য়ে গেছে! আর, সেগুলো গেছে কার পেটে জানেন? আপনার আমার পেটে—আমরা স্রেফ হিমালয় খেয়ে বেঁচে আছি।"

ভদ্রলোক এই পর্যন্ত বলতেই গাড়ি শিয়ালদ এসে থামল, তিনি ব্যস্তভাবে নেমে পড়লেন, আমিও নেমে বাড়ি এলাম, কিন্তু মনটা চঞ্চল হ'য়ে রইল। এমন সময় সদ্য দার্জিলিঙ ফেরৎ এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা। তাঁর কাছে সব খবর নিয়ে জানলাম, দার্জিলিঙ পথের একটি পাহাড়ও খোয়া যায়নি, আগে যেমন ছিল এখনও তেমনি আছে। আরও জানলাম চালে শতকরা পঁচিশ ভাগ কাঁকর মেশানো হচ্ছে বটে, কিন্তু সে কাঁকর হিমালয় পাহাড়-চূর্ণ নয়, রাজমহল পাহাড় থেকে সংগ্রহ করা এবং সেও বড় পাহাড় কেটে নয়, পাহাড়ের অংশমাত্র সংগ্রহ করেই কাজ হচ্ছে, তবে বড় পাহাড় শীগগিরই দরকার হবে।

বুঝলাম, ভদ্রলোক বলেছেন ঠিকই, কেবল তথ্য সংগ্রহে কিছু ত্রুটি আছে। কিন্তু চোখে দেখে এলেন বললেন যে! কে জানে!

দিন অকস্মাৎ পথে ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা। তাঁকে চেপে ধরলাম। তিনি [illegible] "হয় তো আমারই ভুল, হয় তো ঐ পথটুকু ঘুমিয়ে ছিলাম, কিংবা অন্যমনস্ক ছিলাম, তাই পাহাড়গুলো দেখতে পাইনি। কিংবা হয় তো স্বপ্ন দেখে থাকব।"

(জনসেবা, ১৯৪৩)



পরিচয়

দুর্ভিক্ষের জন্যে চাঁদা তোলা উপলক্ষে অচিন্ত্যবাবুর সঙ্গে আমাদের পরিচয়। তাঁর বাড়িতে আমরা চাঁদা আদায় করতে গিয়েছিলাম।

মস্ত বাড়ি, সদাশয় লোক, দানের হাতও বেশ। তাঁর প্রতি আমাদের প্রথম আকর্ষণ এই কারণেই। তারপর তাঁর সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ আলাপ পরিচয় হয়েছে, কিন্তু একটি বিষয়ে তাঁর কাছে আমরা হার মেনেছি। তিনি যে কোন্ দেশীয় লোক তা আমরা বুঝতে পারিনি। তিনি কিছুতেই তাঁর প্রকৃত পরিচয় দিচ্ছেন না।

তাঁর পুরো নাম অচিন্ত্য সিংহ। কিন্তু এই নাম নিতান্তই একটা আবরণ মাত্র; এ ছাড়া তাঁর আরও অনেকগুলো নাম আছে এবং তার কোনোটাই বাংলা নাম নয়।

গায়ের রং প্রায় ইউরোপীয়ানদের মতোই ফরসা, তবে কোনো ভারতীয়েরও এ রকম রং থাকা একেবারে অসম্ভব নয়।

তিনি ইংরেজী বলেন ইংরেজদের মতো, ফরাসী বলেন ফরাসীদের মতো, ইউরোপীয় অন্যান্য ভাষাতেও তাঁর দখল অসামান্য। আবার হিন্দী উর্দু বাংলাতেও তাঁর কথায় কারও কোনো ভুল ধরবার উপায় নেই।

তিনি যদি বাঙালী হতেন এবং নামটা যদি পিতৃদত্ত হত, তা হলে এই নাম নিয়ে কারও কিছু মাথা ঘামাবার ছিল না। কিন্তু তিনি কোন্ দেশীয় তা না বুঝতে পারায় নামটা ছদ্মনাম ব'লে মনে হয়। মনে হয়—তিনি কোন্ দেশীয় লোক তা লোকের চিন্তনীয় নয় বলেই তিনি অচিন্ত্য নামটি গ্রহণ করেছেন। আবার সিংহ থেকে সন্দেহ হয়, হয়তো তিনি ইংরেজ, ব্রিটিশ সিংহ রূপে আমাদের মতো মেষপালের মধ্যে নির্ভয়ে বিচরণ করতে চান।

মনে কৌতূহল জাগল খুবই। তাঁর বন্ধুবান্ধবদের খুঁজে বের করতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু তাঁরা যা বললেন তাতেও কোনো মীমাংসা হ'ল না। তাঁর এক ইংরেজ বন্ধু বললেন, তিনি বোধ হয় ইংরেজ তবে তাঁর পিতামাতা বহুকাল ট্রপিক্স্-এ বাস ক'রে রঙের শুভ্রতা হারিয়ে ফেলেছেন।

তাঁর এক ফরাসী বন্ধু বললেন, ওঁকে তো আমরা ফরাসী বলেই জানি।

ইরানীয় বন্ধু বললেন, উনি বোধ হয় আফগান।

আফগান বন্ধু বললেন, আমার ধারণা উনি পার্শী।

নতুন কিছুই জানা গেল না। আমরা ওঁকে কখনও অচিন্ত্যবাবু, কখনও মিষ্টার সিংহ বলেই ডাকি। ওঁর ধর্মমতও আমার কাছে দুর্বোধ্য। আমি ওঁকে রবিবার দিন চার্চে যেতে দেখেছি। বন্ধুরা কেউ কেউ ওঁকে মসজিদে যেতে দেখেছেন মুসলমানী পোশাকে। প্রতিমা দেখলেও প্রণাম করেন এও আমাদের প্রত্যক্ষ দেখা।

ওঁর সম্বন্ধে উনি নিজেই একটা রহস্য রাখতে চান। জিজ্ঞাসা করলে বলেন, আমি নিজেই তো আমার বড় পরিচয়, এর বেশি জেনে লাভ কি?—কথাগুলো জোর ক'রে হেসে উচ্চারণ করেন।

আমি বলি, কৌতূহল। যে জন্যে ক্রস্-ওয়ার্ড সল্‌ভ করি, যে কারণে ডিটেক্টিভ গল্প পড়ি, সেই কারণেই আপনার পরিচয় জানতে উৎসুক হয়েছি, এবং যতই জানতে পারছি না, ততই ঔৎসুক্য বেড়ে যাচ্ছে।

অচিন্ত্যবাবু তা শুনে একটু হাসলেন মাত্র।

আর এক দিন আমি ও আমার দুই বন্ধু তাঁর কাছে গেলাম আবার তাঁর কাছে তাঁর পরিচয় প্রসঙ্গ উত্থাপন করতে। তাঁর সঙ্গে আমাদের এমন অন্তরঙ্গতা

গড়ে উঠেছে যে, যখন তখন তাঁর বাড়িতে যেতে এখন আর আমাদের সঙ্কোচ নেই। তিনিও আমাদের সঙ্গ পেলে বেশ খুশী হ'য়ে ওঠেন এবং তাঁর শোবার ঘরেই আমাদের ডেকে নিয়ে বসান।

সে দিন গিয়ে তাঁকে বিশেষ ক'রে ধরে পড়লাম। বললাম, আপনার কাহিনী আমাদের আজ বলতেই হবে, আমরা কিছুতেই ছাড়ব না। কেন আপনি আমাদের প্রতি এমন নিষ্ঠুর হচ্ছেন বলুন তো?

নিষ্ঠুর হচ্ছি?

তা ছাড়া আর কি? আপনার সঙ্গে আমাদের এমন বন্ধুত্ব, অথচ একটি জায়গায় আমাদের প্রবেশ নিষেধ ক'রে রেখেছেন।

অচিন্ত্যবাবু হেসে বললেন, আমার কিন্তু এটা বেশ লাগছে। আপনারা সবাই মিলে আমার পরিচয় জানবার চেষ্টা করছেন অথচ জানতে পারছেন না, আমার জীবনের এইটেই একমাত্র থ্রিল, ভাবতে গেলেও মন পুলকিত হ'য়ে ওঠে।

এই কথাগুলো সহজ ভাবেই বলতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু তাঁর অনিচ্ছা সত্ত্বেও কথাগুলো বেদনাসিক্ত হ'য়ে পড়ল। তিনি জোর করেই হাসতে চেষ্টা ক'রে বললেন, অনেক দিন ধ'রে এই আনন্দ আমি ভোগ ক'রে আসছি। পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই আমি এই থ্রিল উপভোগ করি।

আপনার সত্য পরিচয় কি কেউ জানে না?

আমার পিতামাতা জীবিত নেই, তাঁরা জানতেন। তবে সব শুনুন সব কথা।

অচিন্ত্যবাবু সহসা খুব গম্ভীর হয়ে গেলেন। তারপর ধীরে ধীরে বলতে লাগলেন, আমার একটি গোপন কথা আপনাদের কাছে আজ প্রকাশ করব। আমার সুখের কথা সেটা নয়।

তারপর আরও কয়েক সেকেণ্ড চুপ ক'রে রইলেন। আমাদের মুখেও কোনো কথা নেই। সমস্ত ঘরখানা যেন নীরবতায় থমথম করছে।

হঠাৎ সেই নীরবতা ভঙ্গ করে অচিন্ত্যবাবু উত্তেজিত এবং আপ্লুত স্বরে বলে উঠলেন, আমি নিজেই আমার নিজের পরিচয় জানি না।···

অবিশ্বাস করবেন না আমার কথা, সব শুনলে বুঝতে পারবেন।

শুনুন, আমার পিতামাতা ইউরোপে ছিলেন, এইটুকু মাত্র জানি। আরও জানি, তাঁরা একটা দুর্ঘটনায় হঠাৎ দুজনেই একসঙ্গে মারা যান। আমি তখন শিশু, আমি দৈবক্রমে রক্ষা পেয়েছি, কিন্তু দুর্ঘটনায় তাঁদের দেহ পুড়ে যায়। তাঁরা কে ছিলেন, কোত্থেকে এসেছিলেন তা কেউ বলতে পারেনি।

দুর্ঘটনা হয় প্যারিস শহরে। সেখানে এক অনাথালয়ে আমি মানুষ হই। আমার মুখে তখন ভাষা ফোটেনি। কান্না ছাড়া মনের ভাব আর কিছুতে তখনও আমি প্রকাশ করতে শিখিনি। কিছু বড় হ'লে এই কাহিনী আমি অনাথালয়ের কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে শুনি।

আমার বুদ্ধি ছেলেবেলা থেকেই খুব প্রখর, সেজন্য সবাই আমাকে খুব ভাল-বাসতেন, আর তাতে বেশি পড়াশোনা করার সুযোগও আমি পেয়েছিলাম। পড়াশোনায় ভাল হওয়াতে ভাল চাকরি পাওয়ায় আমার কখনও কোনো অসুবিধা হয়নি। কিন্তু এত সাফল্যেও আমার মনে কেবলই একটি প্রশ্ন জাগতে লাগল—আমার পরিচয় কি ? আমার পিতৃভূমি কোথায় ? এই প্রশ্নে মন বড় বিচলিত হয়ে উঠত, সে সময় টাকা পয়সা পসার প্রতিপত্তিকে অত্যন্ত তুচ্ছ মনে হ'ত। এইভাবে আমার মন ক্রমেই আমাকে ধীর স্থিরভাবে কোনো কাজের অনুপযুক্ত ক'রে তুলল, আমি ঐ প্রশ্নের মীমাংসার আশায় দেশবিদেশ ঘুরে বেড়াতে লাগলাম।

আমার মুখ থেকে সবিস্ময়ে উচ্চারিত হ'ল—খুব অদ্ভুত তো আপনার কাহিনী !

অদ্ভুত তো বটেই। আমি একটা দেশে গিয়ে সেখানকার ভাষা, আচার ব্যবহার প্রভৃতি আয়ত্ত করে নিতে পারি অতি সহজেই। আমার নামও সে দেশের ক'রে নিই এবং ভাবতে চেষ্টা করি আমি সেই দেশেরই লোক। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মনের সঙ্গে মেলে না, এবং তখনই সে দেশ ছেড়ে চলে যাই।

এমনিভাবে ঘুরতে ঘুরতে বাংলা দেশে এসে পড়েছি, বছরখানেক এখানে আছি, কিন্তু এর মধ্যেই বাংলা ভাষা এবং বাঙালীর আচার ব্যবহার এমন নিজের ক'রে নিয়েছি যে, আপনারা কেউ বুঝতেই পারছেন না আমি বাঙালী কি না।

অচিন্ত্যবাবুর গল্পে আমরা ডুবে গিয়েছিলাম, ইতিমধ্যে আমাদের চা দেওয়া হয়েছে আমরা খেয়ালই করিনি। অচিন্ত্যবাবু সেদিকে আমাদের মনোযোগ আকৃষ্ট ক'রে একটি সিগারেট ধরালেন এবং সিগারেট টানতে টানতে বলতে লাগলেন—

ভারতবর্ষের কয়েকটা প্রদেশে তো ঘুরলাম, কিন্তু কোথায়ও শান্তি পাচ্ছি না। বাংলা দেশকেও নিজের দেশ বলে মনে হচ্ছে না। ভেবেছিলাম জানা না থাকলেও নিজের পিতৃভূমিতে এসেই ভিতরে ভিতরে একটা গভীর টান অনুভব করব, কিন্তু এখানেও হতাশ হচ্ছি।

জিজ্ঞাসা করলাম, এখন কোথায় যাবেন ?

কিছুই জানি না। অনেক দিন কিছু উপার্জন করিনি, টাকা-পয়সা যা ছিল ফুরিয়ে এল, গরিবভাবেই থাকতে হচ্ছে এখন, কষ্টও পাচ্ছি তাতে খুব। তা ছাড়া আপনাদের বাংলা দেশে দুর্ভিক্ষ লেগেছে। পথে পথে এত মৃতদেহ দেখে মন আরও খারাপ হয়ে যাচ্ছে।

তারপর একটু থেমে বললেন, যেতেই হবে এখান থেকে। এই ভাবে ঘুরে ঘুরে জীবনটা প্রায় শেষ করে আনলাম, বয়স এখন প্রায় ষাট, আরও কিছুদিন পরে হয় তো কর্মশক্তি সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলব অথবা উন্মাদ হয়ে যাব।

প্রশ্ন করলাম, অকারণ পিতৃভূমি খোঁজার জন্যে এত ব্যাকুলতা, এটা কিন্তু আমার কাছে একটু অস্বাভাবিক লাগছে।

তা হয়তো লাগছে। আমার কাছেও লাগে, কিন্তু মনকে বোঝাতে পারি না। এ যেন একটি ধাঁধা ; ছেলে বেলায় ধাঁধার উত্তর বের করার দিকে খুব ঝোঁক ছিল, ক্রস ওয়ার্ড সল্‌ভ করতে আমিও ওস্তাদ, অঙ্ক শাস্ত্রের বড় বড় প্রব্লেমও আমি সহজে সল্‌ভ করতে পারি। আমার মানসিক প্রবণতা ঐ রহস্যভেদের দিকেই বেশি, না করা পর্যন্ত আমি ছটফট করতে থাকি। আপনারাও বলছেন, আমার পরিচয় জানতে আপনাদের ঔৎসুক্য আছে। তা হ'লে বুঝুন আমার নিজের পরিচয় জানতে আমার ঔৎসুক্য আরও কতগুণ বেশি থাকা উচিত। এই প্রশ্নের উত্তর আমাকে বের করতেই হবে, এই পণ করেছি।

তারপর একটু থেমে বলতে লাগলেন, এজন্যে আপনাদের ভারতবর্ষের কোনো জ্যোতিষীকে আমি বাদ রাখিনি। এখন আপনারা যদি কিছু বলতে পারেন, দেখুন।

আমাদের বিস্ময়ের অন্ত ছিল না, তবু এই শেষের কথাটি শুনে না হেসে থাকতে পারলাম না। বললাম বরঞ্চ আমরা উল্টো উপদেশই দিতে পারি। আমাদের কবির ভাষায়—সব ঠাঁই মোর ঘর আছে—কথাটি বিশ্বাস করতে বলি আপনাকে।

বিশ্বাস করার দরকার নেই, উপলব্ধি করছি সব জায়গায়। সবাই আমার বন্ধু, সবাই আমাকে ভালবাসেন, কিন্তু আমার মনকে কি করে বোঝাই ?

এ কথার পরে আর কথা নেই। আমরা চুপ করে থাকি। এ রকম কোনো ঘটনার কথা আমরা এর আগে কখনও শুনিনি।

এই অচিন্ত্যবাবুর কথা আমরা ক'জন বন্ধু মাঝে মাঝে আলোচনা করেছি।

ভদ্রলোক কোন্ দেশের জানি না, কিন্তু তিনি কলকাতা এসে যে বিপদে পড়ছেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কেন না, বাংলা দেশে এখন ঘোর দুর্ভিক্ষ, চালের মণ চল্লিশ টাকা—সব জিনিষই অগ্নিমূল্য। আর সে জন্যে আমাদের অবস্থাও যে খুব ভাল যাচ্ছে তা নয়। আমাদের নিজেদের সমস্যাই এখন এমন প্রবল যে, পরের কথা ভাবার সময় এখন প্রতিদিনই কমে আসছে। বাড়ির দুয়ারে এসে চীৎকার-করা দু'চারজন ভিখারীকে দুটো খেতে দেওয়া ছাড়া দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে আমাদের ব্যক্তিগতভাবে আর কিছু করার নেই। অচিন্ত্যবাবুর কাছ থেকে সেদিন চলে আসার পর এক মাস কেটে গেছে, এর মধ্যে তাঁর কোনো খবরই নিতে পারিনি।

তাঁর বাড়ি খুব দূরে নয়। আমাদের পাড়া থেকে হাঁটা পথে মিনিট দশেকের পথ।

একদিন আমরা তিন বন্ধু রাত আটটা আন্দাজ সময়ে পথের ভিখারীদের ঠেলতে ঠেলতে দেখা করতে গেলাম তাঁর সঙ্গে। শুনলাম, তিনি উপরে একটু কাজে ব্যস্ত আছেন, তাঁর ভৃত্য আমাদের নীচেই বসতে বলল এবং উপরে গেল খবর দিতে।

প্রায় পাঁচ মিনিট পরে ভৃত্য নেমে এসে খবর দিল, তাঁর আসতে একটু দেরি হবে, আপনারা কি অপেক্ষা করবেন?

অপেক্ষা করব বৈ কি—দেখা করতেই এসেছি।

শুনে ভৃত্য যে খুব খুশী হ'ল এমন বোধ হ'ল না। সে বলল, তা হ'লে বসুন। ব'লে সে উপরে চলে গেল। আমরা বসে বসে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

এর মধ্যেই যে অচিন্ত্যবাবুর বেশ কিছু পরিবর্তন ঘটে গেছে এটা বেশ উপলব্ধি করা গেল। আমরা তাঁর নিতান্তই অন্তরঙ্গ বন্ধু এই রকম কথা তিনি আমাদের কাছে অনেকবার বলেছেন। ইতিপূর্বে তাঁর বাড়িতে আমরা এসেছি শুনলে উপর থেকে তিনি তৎক্ষণাৎ নেমে এসেছেন, এক মিনিটও দেরি করেননি, এবং এসে আমাদের উপরে ডেকে নিয়ে গেছেন। তাঁর বাড়িতে গোপনীয়তা কিছুই নেই, কেননা ভৃত্য আর পাচক ছাড়া বাইরের আর কোনো ব্যক্তি সেখানে ছিল না। কিন্তু আজ এমন কি নূতনত্বের আবির্ভাব ঘটল যে আমাদের তিনি অভ্যর্থনা করতেই এলেন না।

পুরো একটি ঘণ্টা কেটে গেল বসে বসে, আর ভাল লাগছিল না। একটি দুষ্ট বুদ্ধি মাথায় এল। বন্ধুদের বললাম, তোমরা বস, আমি চুপে চুপে উপরে উঠে গিয়ে দেখে আসি ব্যাপার কি।

বন্ধুরা বললেন, লুকিয়ে যাওয়া কি ঠিক হবে?

ঠিক হবে কি না জানি না, তবে আমি যাবই। বলে চুপে চুপে উপরে উঠে গেলাম। কিন্তু গিয়ে যা দেখলাম তা সম্পূর্ণ অভাবনীয়।

আমি অন্ধকারে ছিলাম, কেউ আমাকে দেখতে পায়নি, কিন্তু আমি সবই দেখতে পাচ্ছিলাম। অচিন্ত্যবাবুকেও দেখলাম এবং ঐ সঙ্গে আরও অনেক কিছু।

অচিন্ত্যবাবু একা ছিলেন না। আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত দুজন লোক তাঁর সঙ্গে আলাপ করছিলেন। তাঁদের কথা স্পষ্ট শোনা গেল।

আরও একটা নতুন জিনিস লক্ষ্য করলাম। অচিন্ত্যবাবুর বাড়ির ভিতরের উঠানটা এত দিন খালি ছিল, এখন আর খালি নেই, চালের বস্তার পাহাড় জমেছে সেখানে। বস্তার গাদা তেতলার ছাদ সমান উঁচু হয়ে উঠেছে। অচিন্ত্যবাবু গোপনে চাল মজুত করেছেন সন্দেহ রইল না—কেননা সেই চাল বিক্রির জন্যেই পরামর্শ সভা বসেছে। নতুন লোকেরা এই চালের ক্রেতা। তাঁদের দেওয়া নোটের গাদা অচিন্ত্যবাবুর সামনেই পড়ে আছে।

সমস্তই স্পষ্ট বোঝা গেল। সেখান থেকে আবার চুপি চুপি নীচে নেমে এলাম। বন্ধুরা সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে আমার দিকে চাইল।

আমি ইঙ্গিতে তাদের বুঝিয়ে দিলাম—ব্যাপার গুরুতর। আর কিছু বলা হ'ল না, ইতিমধ্যে সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা গেল—আমি তাড়াতাড়ি চেয়ারে বসে পড়লাম; যেন ঐখানেই অনেকক্ষণ বসে আছি এমনি ভাব ফুটিয়ে তুললাম মুখে।

অচিন্ত্যবাবু প্রবেশ করলেন এবং স্মিতহাস্যে তাঁর বিলম্বের জন্যে বিনীত ভাবে ক্ষমা চাইলেন।

আমি বললাম, ক্ষমা চাইতে হবে না।

সে কি—আমি যে এতক্ষণ আপনাদের বসিয়ে রেখেছি—

আমি তাঁকে আর কথা বলার সুযোগ না দিয়ে বললাম, অচিন্ত্যবাবু, আমি আপনাকে একটি প্রশ্ন করব, ঠিক উত্তর দেবেন কি?

নিশ্চয় দেব।

বলুন, বেশ ভেবে বলুন, আপনি কোন্ দেশী লোক, তা কি আপনি জানেন না?

অচিন্ত্যবাবু হঠাৎ অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে গেলেন এবং আবেগভরে বলে উঠলেন—সত্যি বলছি আমি জানি না, যদি জীবনে কোনো দিন সত্য কথা বলে থাকি তা হ'লে শপথ ক'রে বলছি, এর চেয়ে সত্য কথা আর কখনও বলিনি।

আমি বললাম, উত্তম, আমি বিশ্বাস করছি আপনার কথা। এখন আর একটি প্রশ্ন করব,—আচ্ছা, আপনি কি সত্যই জানতে চান পৃথিবীর কোন্ দেশ আপনার পিতৃভূমি ?

অচিন্ত্যবাবু আমার হাত ধ'রে উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বললেন, সত্যিই জানতে চাই, কেন আপনি আমাকে অবিশ্বাস করছেন ?

আমি বললাম, পুণ্য ভারতভূমিই আপনার পিতৃভূমি।

অচিন্ত্যবাবু উন্মাদের মতো চীৎকার করে প্রশ্ন করলেন, ঠিক বলছেন—ঠিক বলছেন—ঠিক বলছেন ?

হাঁ। ঠিক বলছি। জীবনে যদি কোনো দিন সত্য কথা বলে থাকি তা হ'লে এর চেয়ে সত্য আর বলিনি জানবেন।

এই কথার পর আর মুহূর্তমাত্র বিলম্ব করিনি—বন্ধুদের টেনে নিয়ে বেরিয়ে এলাম বাইরে এবং বাইরে এসে তাদের কাছে সব নিবেদন করলাম। সব শুনে আমার আবিষ্কারের গৌরবে তারাও যেন গৌরব বোধ করতে লাগল।

(স্বদেশ, পূজা ১৯৪৪)



কৃষ্ণহরির চাল

দেয়ালের ক্লক ঘড়িতে ঢং ঢং ক'রে দুটো বাজল। কৃষ্ণহরি ঘড়ির দিকে চেয়ে একটুখানি কি ভাবল, তারপর সম্মুখস্থ হিসাবের খাতাগুলো বেঁধে গুছিয়ে রেখে উঠে দাঁড়াল।

তার দৃষ্টি এবারে পড়ল আর এক দিকের দেয়ালে। সেখানে কুলুঙ্গীতে একটি ছোট্ট শ্বেতশীর্ষ রক্তদেহ গণেশ মূর্তি। তার পাশে ধূপদানিতে ধূপের ধোঁয়ার শেষ রেশটুকু তখনও মিলিয়ে যায়নি। বহুক্ষণ ধ'রে এই ধূপের ধোঁয়া ঘরের মধ্যে তার গন্ধ নিবেদন ক'রে গৃহমধ্যস্থ বায়ুমণ্ডলে বেশ একটা পবিত্র ভাব ফুটিয়ে তুলেছে। পাশে

তেলের প্রদীপটিও দেবপূজার উপকরণ হিসাবে নীরবে জ্বলছে, যেন ওটি প্রদীপ নয়, যেন ওটি ভক্ত মনের ভক্তি শিখা, প্রখর নয়, দাম্ভিক নয়, উজ্জ্বল অথচ নম্র।

কৃষ্ণহরি হাতদুটি জোড় ক'রে চোখ বুজে অনেকক্ষণ ধ'রে সিদ্ধিদাতার উদ্দেশ্যে প্রণতি জানাল।

তারপর বিদ্যুতের বাতিটি নিবিয়ে শুয়ে পড়ল। কিন্তু তখনও তার মাথার মধ্যে অনেকগুলো শুঁয়ো পোকা ঘুরে বেড়াচ্ছে—হিসাবের খাতার অঙ্কের শুঁয়ো পোকা।

ঘুম এল না সহজে।

আট হাজার টাকা আটকা পড়ে আছে, আগামী তিন মাসে সেটা আশী হাজার হওয়া দরকার।

আট হাজারের একটি শায়ক চল্লিশ হাজার টাকার লক্ষ্য ভেদ ক'রে মুনাফার মোটা শিকারটা ঘরে তুলেছে। দ্বিতীয় আট হাজারকে সে এখনও ছাড়েনি, যথাসময়ে ছাড়বে ব'লে হাতে রেখেছে।

কৃষ্ণহরি বহুদিনের ব্যবসায়ী, তার পণ্য হচ্ছে চাল।

বাঙালীর প্রাণ তার হাতে।

চালের ব্যবসায়ে সফল হ'তে হ'লে চালের আসা যাওয়ার যত রকম প্রশস্ত অপ্রশস্ত পথ আছে সব জানা দরকার, কৃষ্ণহরির সে সব পথ অজানা নয়, তদুপরি তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়টিও সবে দেখা দিয়েছে।

বর্ষার আগে পিঁপড়ের মনে ভাবী দুঃসময়ের আভাস জেগে ওঠে, সে সময়-থাকতে খাদ্য সংগ্রহ ক'রে রাখে দুর্দিনের জন্যে।

যে পাখী শীতকে ভয় করে, সে শীত আসার আগেই স্থানত্যাগ করে। বুদ্ধি খরচ ক'রে নয়, সহজাত সংস্কারের বশে।

কৃষ্ণহরিও বাজারের ভাবী পরিবর্তনের আভাস পায় এমনি ভাবেই; যখনই বোঝে বাজার চড়বে তখনই সে চাল মজুত করতে শুরু করে, যখন বোঝে দর কমবে তখন তাড়াতাড়ি সব বিক্রি করে দেয়।

মণ-করা কিছার আনা ওঠা নামাই তার কারবারের পক্ষে এতদিন যথেষ্ট ছিল, এবং এ জন্যে যেটুকু বুদ্ধি দরকার সে বুদ্ধি তার ছিল, তদুপরি ছিল অভিজ্ঞতা।

কিন্তু যুদ্ধের বাজারে এই বুদ্ধি তার সহজাত সংস্কারের মতো মস্তিষ্ক-নিরপেক্ষ হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল, পশুপাখী কীট-পতঙ্গের মতোই।

১৯৪২ সালের মাঝামাঝি সময়। চালের দাম ধাপের পর ধাপ চ'ড়ে যাচ্ছে। পাঁচ থেকে দশ, দশ থেকে পনেরো, পনেরো থেকে কুড়ি, কুড়ি থেকে পঁচিশ।

কৃষ্ণহরি অসীম ধৈর্য আর অপরিসীম গাম্ভীর্য নিয়ে ব'সে আছে। তার মানসিক দৃষ্টি স্থিরভাবে নিবদ্ধ আছে এই দিকেই, বাইরের দৃষ্টির সঙ্গে সে দৃষ্টির কোন সম্বন্ধ নেই।

পাঁচ টাকার চাল পঁচিশ টাকা হ'ল, তবু তার মনে কোনো আলোড়ন নেই, চাল বিক্রির বিশেষ গরজও নেই।

কিন্তু সে জন্যে তার কোনো অনুতাপও নেই। কেননা, ১৯৪২ সালে যা ঘটবে. তার আভাস সে ১৯৪১ সালে পেয়েছিল। আর সেই জন্যেই সে চাল বিক্রির চেয়ে চাল কেনার দিকেই নজর দিয়েছিল বেশি।

একবার মাত্র কৃষ্ণহরির মনে হয়েছিল যদি সবটা প্ল্যানই মাটি হয়। মনে হ'তেই পঁচিশ টাকার মুখে এসে সে অর্ধেক চাল বিক্রি করে দিল। অর্ধেক মানে দশ হাজার টাকার চাল। কেনা ছিল পাঁচ টাকা মণ, মুনাফা পেল চল্লিশ হাজার টাকা। বাকী দু হাজার মণ হাতে রইল।

দর যখন পঁচিশে উঠেছে, তখন পঞ্চাশেই বা উঠবে না কেন?

কৃষ্ণহরির একটা খুচরা দোকান ছিল। সে দোকান যেমন চলছিল তেমনি চলতে লাগল। সেখানকার হিসাব আলাদা, সেখানে দৈনন্দিন সাময়িক দরে নিয়মিত চাল কেনা-বেচা চলে, মুনাফা সেখানে পরিমিত।

এই দোকানটি হচ্ছে কৃষ্ণহরির বাইরের পরিচয়, নিতান্তই বাইরের। জাঁকজমক নেই, অহঙ্কার নেই, দাম্ভিকতা নেই, বাইরে যেন তার কোনো ঐশ্বর্যই নেই। এখানে সে একজন সাধারণ ব্যবসায়ী, অন্য পাঁচ জনেরই মতো।

—যেন ভারতীয় আদর্শের প্রতীক। বাইরে দীন হীন, নিরাভরণ, নিরহঙ্কার, কিন্তু অন্তরের ঐশ্বর্যে ধনী।

সেই অন্তর সব সময়েই অন্তরালে থাকে, কেউ তাকে দেখতে পায় না, দেখলেও কেউ তা চিনতে পারে না। কথায় বলে, জহুরী না হ'লে জহর চেনে না।

কিন্তু আছে, সংসারে গুণী লোকও আছে, যে গুণীর মর্যাদা বোঝে; নইলে এ সংসার দুদিনে অরণ্যে পরিণত হ'ত। সে রকম গুণীর সংখ্যা কম হ'লেও আছে। কৃষ্ণহরিরও সমঝদার লোকের অভাব নেই।

কৃষ্ণহরির অন্তর-পথে যাদের ঘনিষ্ঠ গতায়াত, তাদের একজনের সঙ্গে তার কথা হচ্ছিল সেদিন। নাম তার সাধুচরণ। দুজনেরই মুখ উদ্বেগে মলিন, দুজনেই ভাবী বিপদের আশঙ্কায় ম্রিয়মান।

সাধুচরণ বলল, তা হ'লে তো অতি ভয়ানক কথা! চালের দাম সরকার বেঁধে দেবে, আর মজুত চাল ধরবে? কাল থেকেই কাজ আরম্ভ হবে?

কৃষ্ণহরি অধীর ভাবে বলল, শুনছি তো তাই, নইলে আর তোমাকে ডাকব কেন?

সাধুচরণ গর্বিতভাবে কৃষ্ণহরির দিকে চাইল।

কৃষ্ণহরি বলল, এখুনি যাও উত্তরপাড়া তোমার সেই লোকের কাছে, গিয়ে বল, অন্ততঃ পাঁচ শ বস্তা চাল কাল রাত্রের মধ্যেই সরাতে হবে।

কিন্তু অত চাল—!

কেন, নৌকো তার কখানা?

যা আছে তাতে পঁচিশ বস্তার বেশি ধরবে ব'লে মনে হয় না। তবে আমি আরও লোক দেখছি।

দুজনের স্মরণ পথে যত গুণী লোকের নাম মনে পড়ল, এক দিনের মধ্যেই তাদের সঙ্গে যোগাযোগের ব্যবস্থা করতে হবে যেমন ক'রে হোক।

সাধুচরণ ব্যস্ত ভাবে বেরিয়ে গেল, নষ্ট করার মতো সময় হাতে নেই। কৃষ্ণহরিও হরিনাম স্মরণ ক'রে বেরিয়ে পড়ল।

হাওড়া অভিমুখী লোক্যাল ট্রেনে সেই দিনই সন্ধ্যায় দুজন প্রৌঢ় লোক দৈববশত পাশাপাশি ভ্রমণ করছিল, তারা পরস্পর সম্পূর্ণ অপরিচিত।

তাদের একজন আসছে বর্ধমান থেকে, আর একজন উঠেছে শেওড়াফুলি থেকে।

বর্ধমানের লোকটির মুখ বিষণ্ণ।

গাড়িভর্তি যাত্রী, কারো মুখই প্রসন্ন নয়। দেশের অবস্থা বড় খারাপ, খুশী হওয়ার মতো মন কারোই নেই।

যুদ্ধের বিভীষিকা, দুর্মূল্যতার বিভীষিকা, এবং সবচেয়ে মারাত্মক অনিশ্চয়তার বিভীষিকা।

প্যাসেনজারদের মধ্যে দেশের অবস্থা নিয়েই আলাপ হচ্ছিল। কেউ কাউকে

চেনে না, অথচ ক্ষণকালের জন্যে তাদের মধ্যে যেন একটা অন্তরঙ্গতার সৃষ্টি হয়েছে। সমান বিপদে অনাত্মীয়ও আত্মীয় হ'য়ে ওঠে।

বিনা ভূমিকায় উক্ত বর্ধমান এবং শেওড়াফুলির যাত্রী দুজনও কখন সেই আলাপে যোগ দিয়েছে।

শেওড়াফুলি বলল কর্মফল, মশাই কর্মফল, নইলে দেশের এমন হাল হবে কেন!

—চরম দার্শনিক কথা, এর উপরে আর কোনো কথা নেই। কথাটা শুনে সবাই তৃপ্ত হ'ল।

বর্দ্ধমান দীর্ঘ নিশ্বাস ছেড়ে বলল, ভগবানের মনে কি আছে কে জানে!

শেওড়াফুলি বলল, যাই থাক, এদেশের একটা বড় সুবিধা আছে মশাই।

সবাই তার দিকে চাইল।

সুবিধাটা হচ্ছে এই যে যত কষ্টেই পড়ুক, কথাটি না ব'লে এ দেশের সবাই সব কিছু সহ্য ক'রে যায়।

বর্ধমান বলল, তা আর যাবে না? ধর্মটাকে তো আর কেউ উড়িয়ে দেয়নি। ধর্ম না মানলে এক বেলাও সহ্য করতে পারত না।

শেওড়াফুলি বলল, এদেশের চাষারাও যা জানে, বিলেতের লোক বি-এ-এম-এ পাস ক'রেও তা জানে না। দেহতত্ত্বের জ্ঞান না থাকলে এতদিন দেশ উচ্ছন্ন যেত। শুনেছি, এত অল্পে খুশী থাকা যায়, তা নাকি আর কোনো দেশের লোক ভাবতেই পারে না।

একজন যাত্রী বলল, বিদেশীরা এসেই এদেশে অশান্তি ঢুকিয়েছে, এখন বাবুরা আন্দোলন চালিয়ে দেশের লোককে রাজা বানাবেন। আরে বাপু এদেশের লোক রাজা হ'তে চেয়েছে কবে? দুবেলা দুমুঠো অন্ন, আর হরিনাম। রাজা হ'লে কি কেউ এর মর্ম বুঝত? এমন আর কোন দেশ আছে যেখানে লোকে এক বেলাও পেট ভ'রে খেতে পায় না, ছেঁড়া কাপড় প'রে থাকে, কিন্তু প্রত্যেকে ব্রহ্মজ্ঞানী?

কোনো কোনো যাত্রীর কাছে কথাটা একটু বাড়াবাড়ি ব'লে মনে হ'লেও দেশের গর্বে তাদের মন তখন উৎফুল্ল হ'য়ে উঠেছে, তারা কোনো প্রতিবাদই করল না।

কিন্তু তবু একটি লোক ব'লে উঠল, ব্রহ্মজ্ঞানী ঠিক না বলা গেলেও দেহতত্ত্ব-জ্ঞানী খুবই বলা যায়।—

শেওড়াফুলি একটুখানি উত্তেজিত ভাবে বলল, থামুন মশাই, আপনারা নব্য

শিক্ষিতেরা তো কিছুই মানেন না। যে দেশের লোকের অতিথিসেবা আর সর্বজীবে দয়া জন্মকাল থেকে শিক্ষা, সে দেশের লোককে আপনি কি বলবেন? একটা অজ পাড়াগাঁয়ের ছেলেও এ সব জানে—

যাত্রিটি বলল, কিন্তু জোচ্চুরিতেও এ দেশের লোক কম পাকা নয়।

আলোচনার মোড় একেবারে ঘুরে গেল।

বর্ধমান বলল, ইংরেজী শিক্ষার ফল মশাই, ইংরেজী শিক্ষার ফল।

শেওড়াফুলি সামান্য ইংরেজী জানত, সে প্রতিবাদ ক'রে বলল, যার ফলই হোক, জোচ্চুরিটা যে জানে তা তো আর অস্বীকার করা যায় না।

বর্ধমান বলল, অস্বীকার করব কেন? এ দেশের ব্যবসাদারদের জোচ্চুরিতেই তো আজ দেশের এই অবস্থা। কেউ চাল মজুত করছে, কেউ কাপড় মজুত করছে, কেউ তেল মজুত করছে, কেউ লাখপতি হচ্ছে, কেউ না খেয়ে মরছে।

শেওড়াফুলি বলল, এর ফল ফলবে না ভেবেছেন? ভগবান তো এখনও কাজে ইস্তফা দেননি!

পাশের যাত্রী বলল, যুদ্ধ বেধে একটা বেশ বড় জিনিষ শেখা গেল।

সবার জিজ্ঞাসু দৃষ্টি ঘুরল সে দিকে। যাত্রী বলল, আগা পাস্তালা কে কতবড় চোর তা দেখার সুযোগ পাওয়া গেল। দিনে ডাকাতি হচ্ছে মশাই, দিনে ডাকাতি।

আর এক যাত্রী বলল, যুদ্ধকে নমস্কার বাবা! খুরে দণ্ডবৎ।

গাড়ি ইতিমধ্যে হাওড়া ষ্টেশনে এসে থামল, যাত্রীর গোলমালে, কুলীদের চীৎকারে আলোচনার শেষ কথা গুলো ডুবে গেল।

রাত্রি দশটা।

কৃষ্ণহরির গুদামঘরে কৃষ্ণহরি আর সাধুচরণ মুখোমুখী বসে।

সাধুচরণ আশ্বাস দিচ্ছে, তাঁরা সবাই এসেছেন, নৌকোগুলো ঘাটে পৌছলেই তাঁরা এখানে এসে পড়বেন—যত রাতই হোক।

সবার নৌকোই সকালে রওনা হয়েছে।

কৃষ্ণহরি নিজে বর্ধমান থেকে ব্যর্থ হ'য়ে ফেরাতেই মনে মনে সন্দেহ ছিল, হয় তো সাধুর প্ল্যানও ফেঁসে যায়।

কিন্তু ফেঁসে গেল না।

গঙ্গার ধারেই গুদাম। ঘরের ক্ষীণ আলোতে পাঁচজন গুপ্ত ক্রেতা এবং দুজন বিক্রেতার সচকিত দৃষ্টি বিনিময় হতেই সবাই কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধ করল মুহূর্ত কালের জন্যে। হঠাৎ মনে হ'ল তারা পরস্পর পরিচিত।

মনে হ'তেই তাদের হাত-পা যেন জমে বরফ হয়ে গেল। না পারল তারা নড়তে, না পারল একটা কথা বলতে।

বর্ধমানের লোকটির মধ্যে প্রথম প্রাণের সাড়া জাগল। তারই ইঙ্গিতে এবং তারই অভয়বাণীতে ওদের মধ্যেকার সকল সঙ্কোচ ঘুচে গিয়ে একটা প্রগাঢ় বন্ধুত্বের ভাব জেগে উঠল। বলা বাহুল্য এই লোকটিই কৃষ্ণহরি।

সে বলল, লজ্জা পাবার কোনো কারণ নেই, আপনারা আমার কথাগুলো শুনুন। আচ্ছা, বলতে পারেন আমরা কেন জোচ্চোর হয়েছি?—কেন আমাদের এই অধঃপতন? কেন আমরা অভাবগ্রস্তকে বঞ্চিত ক'রে এত চাল ব্ল্যাক মার্কেটে চালান করছি?

প্রশ্নটা শুনে সবাই চিন্তা করতে লাগল, কিন্তু কেউ কোনো জবাব দিতে পারল না। তারা কেউ জানে না কেন জোচ্চোর হয়েছে।

একজন ক্ষীণস্বরে বলল, লোভে পড়েই বোধ হয়।

কৃষ্ণহরি বলল, কি যে বলেন মশাই।

সবাই বোকার মতো চেয়ে রইল কৃষ্ণহরির দিকে।

কৃষ্ণহরি বলল, এই জোচ্চুরিতে আমাদের কোনো হাত নেই, আমরা নিরপরাধ।

শেওড়াফুলি বলল, কথাটা ন্যায্য বলেই মনে হচ্ছে, কিন্তু বুঝতে পারছি না তো।

বুঝতে পারবেন। বয়স হোক বুঝতে পারবেন। এখন শুধু একটি কথা জেনে রাখুন যে আমরা আপাতত যত জোচ্চোরই হই মনে মনে আমরা তো এখনও সাধুই আছি, ধর্মজ্ঞান আমাদের তো নষ্ট হয় নি। মন তো আমাদের এখন'ও ভগবানের চিন্তাতেই মেতে আছে। আমরা যে কাজ করি সেটা তো বাইরের, একেবারেই বাইরের।

এ কথায় সবারই মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

কৃষ্ণহরি বলতে লাগল, এখনও কি সন্দেহ করছেন আপনারা?

সবাই সমস্বরে বলল, না।

তা হ'লেই বুঝে দেখুন, এতক্ষণ আপনারা অকারণ লজ্জা পেয়েছেন। আর এই লজ্জা পাওয়া থেকেই বোঝা যাচ্ছে আমরা ভারতীয় ঋষিদের আদর্শে আকণ্ঠ ডুবে আছি। গীতা বলেছেন, আত্মাকে কেউ স্পর্শ করতে পারে না—সুতরাং

আত্মা আমাদের নিষ্পাপ। চোর হচ্ছে আমাদের দুখানা হাত, জোচ্চোর হচ্ছে আমাদের দেহ—যা আজ বাদে কাল পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। অতএব কিসের ভাবনা ?

শেওড়াফুলি বলল, তা হ'লে নিশ্চিন্ত মনে চাল সরাতে পারি ?

সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত মনে। কলিকালটা কোনো রকমে কাটিয়ে দিতে পারলেই সব ঠিক হয়ে যাবে, আপনা থেকেই তখন সব চলে যাবে তখন দেহ আর আত্মা দুইই সমান বিশুদ্ধ হবে।

গুদাম ঘরের তৎপরতা বেড়ে গেল। বস্তা বস্তা চাল স'রে যেতে লাগল অবিরাম ধারায়। কৃষ্ণহরির সম্মুখে নোটের পাহাড় জমে উঠল।

দিনের আলো ট্রেনের মধ্যেকার কথাগুলোর যে অর্থ প্রকাশ করেছে, রাতের অন্ধকার সেই কথাগুলোরই আর এক অর্থ বহন ক'রে নিয়ে এল। আর সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকারের নীরব জয়ধ্বনিতে গুদাম ঘরের আবহাওয়া পুলকিত হ'য়ে উঠল।

(অভিযান, ১৯৪৩)



তারিণী মাষ্টার

ছোট ছেলেদের ক্লাসে ইংরেজী গ্রামার পড়ালে কি হয়, তারিণী মাস্টার বাংলাদেশের কোনো একটা অখ্যাত স্কুলের তৃতীয় শিক্ষক হওয়ার জন্যে এ পৃথিবীতে আসেনি! বয়স তার পঞ্চাশের কাছাকাছি, কঠিন বাস্তব নিয়েই তার কারবার, কিন্তু চোখে তার স্বপ্ন!

"আই গো—উই গো, আই অ্যাম গোইং—উই আর গোইং, আই হ্যাভ গন—উই হ্যাভ গন"—দিনের পর দিন চাকা চলেছে ঘুরে, অথচ গাড়ি এক পা চলছে না। ছেলেরা যত পড়ছে ব্যাকরণ, ভাষা তত সরে যাচ্ছে দূরে; ব্যাকরণের সিঁড়ি ভেঙে ছেলেরা ভাষার মণি-সৌধে

পৌঁছতে পারে না বটে, কিন্তু ক্লাসে পড়াতে পড়াতে তারিণী মাস্টার অতি সহজেই সিঁড়িগুলো পার হ'য়ে যায়। তারিণী মাস্টারের মনে স্বপ্ন জাগে।

বিশ বছরের চাকরি। ক্যাশ জমেছে মাত্র হাজার খানেক টাকা। লগ্নি কারবারে এ-নাগাদ সুদ পাওয়া গেছে হাজার দুই টাকা। হোমিওপ্যাথি প্র্যাক্‌টিস্ ক'রে মাসে অন্তত: দশটি টাকা বাঁধা। ডাকঘরের সেভিংস ব্যাঙ্কে মাসে মাসে এই টাকাটা আলাদা জমা হয়।

ছেলেরা নামতা পড়ার মতো আবৃত্তি ক'রে চলেছে—"আই গো, উই গো—আই অ্যাম গোইং, উই আর গোইং।"

পনেরো মিনিট টিফিনের ছুটি—ঘণ্টা বাজল—কোলাহল করতে করতে ছেলেরা ক্লাস থেকে বেরিয়ে পড়ল। তারিণী মাস্টার চলল বাজারের দিকে। কাছেই বাজার। তার বাড়ির জমিতে নানারকম তরিতরকারী হয়, চাকর সেগুলো বাজারে নিয়ে আসে বিক্রির জন্যে। টিফিনের সময় তারিণী মাস্টার বাজারে গিয়ে সেই বিক্রির পয়সা আদায় ক'রে আনে। তা ছাড়া বাজারের আশেপাশে যদি কোনো রোগী থাকে তাদেরও সে সময় দেখা যায়—দুএক টাকা পাওয়াও যায় মাঝে মাঝে।

বড়দের মহলে তারিণী মাস্টার কৃপণ ব'লে নিন্দিত—তার একমাত্র খাতির ছেলেদের কাছে। তারিণী মাষ্টারের কাছে কেউ ফেল করে না।

নিন্দার ভয় তার নেই। বরঞ্চ কৃপণ নামে তার কিছু গর্বই আছে।

সে বলে যুদ্ধের বাজারে টাকা তো ধুলোর সামিল; এই ধুলো ছড়িয়ে দাতাকর্ণ সাজার মতো বোকা আমি নই। যুদ্ধ থেমে যাক, তখন সবাই বুঝবে এ বাজারে কৃপণ হওয়া তিন পুরুষের ভাগ্যি।

যুদ্ধ অবশ্য পঞ্চাশ বছর ধ'রেই হচ্ছে না, যুদ্ধের আগেও তারিণী মাষ্টারের হাত থেকে একটি পয়সা কেউ খসাতে পারত না—এবং টাকাও তখন ধুলো ছিল না—তখন অবশ্য কৈফিয়ৎটা পৃথক ছিল।

তারিণী মাস্টারকে এ জন্যে অপরাধী করা যায় না, পাঁচটি মেয়ে তাকে বিয়ে দিতে হবে—ছেলেও আছে গোটা তিনেক এবং তাদের ভবিষ্যৎ আছে।

১৯৪৩ সালের ঘটনা। যুদ্ধের নানা রকম গুজব ভেসে আসে গ্রামে। খবরের কাগজ দৈনিক আসে না। সমস্ত গ্রামে একখানি মাত্র সাপ্তাহিক কাগজ এবং পাঠক সংখ্যা দু'শর উপরে। সকল হাত ঘুরে এক একখানা কাগজ এক মাসের পুরনো হয়ে যায়, তখনও তার পাঠ চলতে থাকে।

কখনো শোনা যায়, জার্মানরা বোম্বাইতে এসে নেমেছে ; কখনো শোনা যায়, জার্মান বোমায় বিলেত দেশটা সমুদ্রে ডুবে গেছে, ভেসে আছে শুধু স্কটল্যাণ্ডের পাহাড়গুলো। জাপানের ভয়ে কলকাতা থেকে পলায়িত লোকেরা গিয়ে বলে, এতদিনে কলকাতা গুঁড়ো হয়ে গেছে।

এ সব প্রত্যক্ষদর্শীর কথা, অবিশ্বাস করার উপায় নেই। গ্রামের লোকের মনে এ সব কথা মহা উত্তেজনার সৃষ্টি করে, একঘেয়ে পল্লীজীবনে এ সব গুজবের দাম আছে, তারা এরই মধ্যে তাদের জীবনের কিছুটা সার্থকতা খুঁজে পায়। দিনগুলো একটা অনাস্বাদিতপূর্ব চাঞ্চল্যের মধ্যে দিয়ে কাটতে থাকে।

ক্রমে কাপড়ের দাম বাড়তে থাকে, কেরোসিন তেল পাওয়া যায় না; আরও পরে চালের দাম কল্পনার সীমা ছাড়িয়ে যায় ; তখন তাদের মনে আর সন্দেহ থাকে না যে একটা গুরুতর কিছু ঘটছে এবং ঘটনাস্থলও খুব বেশি দূরে নয়।

তারিণী মাস্টারের মনে আশঙ্কা জেগে ওঠে। স্কুলের ছেলে কমতে থাকে. মাইনে দেয় না কেউ, জীবন ধারণের মূল্য-সীমা আকাশ স্পর্শ করে।

বহু রকম গুজব ছড়িয়ে পড়ে গ্রামে, তার মধ্যে কোন্‌টা সত্য কোন্‌টা মিথ্যে তা যেমন বোঝা যায় না, তেমনি কোন্‌টা ভাল কোন্‌টা মন্দ তাও বোঝা যায় না। এইটে বোঝার ক্ষমতা ছিল তারিণী মাস্টারের। বহু রকম গুজবের মধ্যে একটিকে সে বাছাই ক'রে নিয়ে তার উপরে সমস্ত অন্তরটিকে ঢেলে দিয়ে তাকে সে পুষ্ট করতে লাগল। এ গুজব নয়—স্বপ্ন। এই স্বপ্ন যেমন ক'রে হোক সফল করতে হবে।

শোনা গেল, কলকাতা শহরে টাকার ফল্গুনদী আবিষ্কার হয়েছে, যে তার গতিপথ আবিষ্কার ক'রে রাত্রির অন্ধকারে চুপে চুপে মাটি খুঁড়ে ঘড়া ভরতে পারে, সে চব্বিশ ঘণ্টায় নির্ঘাৎ লক্ষপতি। কত লোক যে এই গুপ্ত নদীর সন্ধান পেয়েছে তার সংখ্যা নেই। এর নাম হচ্ছে ব্ল্যাক মার্কেট। তারিণী মাস্টারেরই এক পূর্ব পরিচিত বন্ধু এই ব্ল্যাক-মার্কেটের কৃপায় ষাট হাজার টাকা জমিয়ে ফেলেছে এক মাসের মধ্যে—অথচ লোকটি মাসে ষাট টাকার বেশি কখনও চোখে দেখেনি।

আরও শোনা গেল, তার এক দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় যথাস্থানে প্রণামী দিয়ে কতকগুলো শস্তা জিনিস আগুনের দরে সরবরাহ ক'রে লাখের উপরে জমিয়ে ফেলেছে—উপরন্তু কল্‌কাতায় দুখানা বাড়ি কিনে বসেছে।

তারিণীর প্রতিভা পূর্ণরূপে জাগ্রত হয়ে উঠল ; সে ভেবে দেখল, এই পথ ছাড়া

তার গতি নেই। লক্ষ টাকার স্বপ্ন তাকে ঘর-ছাড়া করল। সে হঠাৎ নিরুদ্দেশ হ'ল। তার এই খবর তার স্ত্রী ছাড়া আর কেউ জানল না।

কলকাতার এক মেসে তারিণী মাস্টার এসে বাসা নিয়েছে। কি দীপ্তি তার চোখে মুখে! আধ্যাত্মিক পথে সাধনা ক'রে সোনার সমাজ আর সংসারকে যারা সীসা মনে করে, তাদের মুখে দেখা যায় এই দীপ্তি। পারিবারিক বন্ধন কাটিয়ে যারা সন্ন্যাস গ্রহণ করে, তাদেরও মুখে ফোটে এই দীপ্তি। তারিণী মাস্টারও আজ চিরদিনের অভ্যাস এবং পরিবেশ-বন্ধন-মুক্ত সন্ন্যাসী। কথাটা একটুও বাড়িয়ে বলা নয়, সে গৃহ ত্যাগের সময় প্রতিজ্ঞা ক'রে এসেছে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ না হলে সে স্বদেশে ফিরবে না, এবং সে জন্যে যেখানে যত টাকা তার জমা ছিল, সমস্ত তুলে এনেছে। যদি সবই যায়, যাক—ধীর পথে চলার অভ্যাস তার আছে, হীন জীবন যাপনের অভ্যাসও তার আছে, সুতরাং ভয় কি?

তারিণী মাস্টার চোরাবাজারের গলিঘুঁজি চিনে নেওয়ায় কাজে লেগে গেল কলকাতা পৌঁছেই। হাতে তার হাজার পাঁচেক টাকা।

দিন দশেকের মধ্যেই একটি পথের সে সন্ধান পেল। সে জানতে পারল, একটি বিশেষ সৌভাগ্যবান লোককে হাজার তিনেক টাকা ঘুস দিলে একটা বিশেষ জিনিসের সরবরাহ ভার সে পেতে পারে। এই লোকটা একজন দালাল। টাকা তাকে দিতেই হবে, উপায় নেই।—দেওয়ার কোন প্রমাণ না রেখেই দিতে হবে। কিন্তু ক্ষতি কি? এখন থেকে অজানার উপরেই যে তার নির্ভর।

মুখের কথাতেই কাজ উদ্ধার হ'ল। বাকী দু'হাজার টাকার মাল কিনে সে ঐ দালালকে সরবরাহ করল এবং বেশ কিছু মুনাফাও রইল তাতে।

চোরাবাজারের অন্ধকার পথ ক্রমশঃই তারিণী মাস্টারের কাছে আলোকিত হ'তে লাগল। আরও দু'একটা পথ সে দেখতে পেল। নতুন পথের দেবতাকে ঘুস দিতে হবে পাঁচ হাজার টাকা। পাঁচ হাজার টাকা দিতে তারিণী মাস্টারের কোনো অসুবিধাই হ'ল না।

টাকা দেওয়ার পর জানা গেল, দৈবক্রমে অর্ডার পেতে একটু দেরি হবে। কিন্তু ভাবেই যে এ বিষয়ে সন্দেহ করার কোনো কারণ নেই—কোনো একটা টেক্‌নিক্যাল গোলমালে অর্ডারের তারিখ পিছিয়ে গেছে। এই অর্ডার সরবরাহ করতে পারলে পাঁচ হাজার পঁচিশ হাজারে গিয়ে ঠেকবে।

হাতে কলমে লাভ ক'রে—এবং ভবিষ্যতে অনেকগুণ বেশি লাভের নিশ্চিত আশায় তারিণী মাস্টার একটু বেশি খরচ ক'রেই কলকাতায় আছে। মাস দু'য়ের মধ্যেই যে লাখপতি হবে, তার পক্ষে হিসেব ক'রে খরচ করা আর চলে না। আরও কারণ, সে আজীবন কৃপণ, আজীবন সে নানা ফন্দি-ফিকিরে দু'টাকা এক টাকা করে জমিয়ে আসছে। এক সঙ্গে হাজার টাকা খরচ করার সুযোগ সে কখনো পায়নি। কিন্তু চোরাবাজারের খর-আবর্তে পড়ে তার সমস্ত শিক্ষা এবং অভ্যাস ওলট-পালট হয়ে গেছে। এক কথায় তিন হাজার টাকা, এক কথায় পাঁচ হাজার টাকা পরের হাতে সমর্পণ করা তারিণী মাস্টার কখনো জানত না। পুরনো অভ্যাস যে মুহূর্তে ভেঙে গেল, সেই মুহূর্ত থেকে তারিণী মাস্টার আর কৃপণ নয়। কিন্তু তবু তার পথ চলার সময় মাঝে মাঝে ভয় হয়, থেকে থেকে চমকে ওঠে, স্কুলের ছেলেদের দেখে লজ্জায় মাথা নীচু করে। যদি কেউ তাকে চিনে ফেলে!

এ দিকে কলকাতা শহরে টিকে থাকার দাবী দ্বিগুণ থেকে চতুর্গুণ, চতুর্গুণ থেকে আটগুণ বাড়তে আরম্ভ করেছে। চালের মণ চল্লিশ টাকা—সব কিছুর অগ্নিমূল্য। মেসের খরচ অনেক বেড়ে গেল। তারিণী মাস্টার অল্পদিনের মধ্যেই রিক্তহস্ত হয়ে পড়ল। এদিকে অর্ডার পেতে আরও এক মাস দেরি। অর্ডারি মাল সে ধারেই কিনতে পারত—ততখানি ক্রেডিট তার প্রথম বারেই লাভ হয়েছে। সম্পূর্ণ ক্রেডিট বললে ভুল হবে। ইতিমধ্যে তার এক অংশীদারও জুটেছে, সেই এ বারের অর্ডারি মাল দিতে পারত—লাভের একটা মোটা অংশ পেয়ে।

ঘরভাড়া, মেসের চার্জ, চাকরের বেতন, ধোপা নাপিত প্রভৃতি শত রকম দাবী এক একটা টর্পীডোর মতো এসে আঘাত করতে লাগল অজানা সমুদ্রে ভাসমান তারিণী মাস্টার নামক সওদাগরি জাহাজের গায়ে। জাহাজ ক্ষত-বিক্ষত হতে লাগল—ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে সমুদ্রের অতল তলায় ডুবে যেতে আর দেরি নেই।

এদিকে কলকাতার পথে পথে নিরন্নদের স্রোত বয়ে চলেছে। পথে পথে মৃত-দেহ। সমস্ত শহরে শ্মশানের বীভৎসতা! এই শব-সঙ্কুল মহা-শ্মশানের বুকে বসে যারা তান্ত্রিক সাধনায় সিদ্ধ হচ্ছে, বশীভূত পিশাচ-প্রেতেরা তাদের কুবেরের ভাণ্ডার থেকে ধনরত্ন এনে দিচ্ছে মুঠো মুঠো। যারা শব-সাধনায় ব্যর্থ হ'ল তাদের আর কোনো চিহ্নই রইল না এই শহরের বুকে।

দালাল কথা দিয়েছে, আর একটি মাস সবুর করলেই সাধনা সিদ্ধ হবে। কথা মিথ্যে নয়—সে এত টাকা ঘুস নিয়ে মিথ্যে বলেনি, তাকেও এই ক'রে খেতে হয়।

সে দিন দালালের সঙ্গেই কথা হচ্ছিল। তারিণী মাস্টার শুনে বলল, একটি মাস!

দালাল হেসে বলল, একটি মাস—এমন কি বেশি হ'ল?

তারিণীর মাথা ঘুরতে লাগল কথাটা শুনে। সে কাতর ভাবে তার দিকে চেয়ে রইল। হাতে তার যে আর একটি পয়সাও অবশিষ্ট নেই!

কিন্তু সে কথা সে দালালকে বলতে পারল না।

দালাল পরামর্শ দিল, দেশ থেকে ঘুরে আসুন না একবার। এখানে মাসখানেক চুপ ক'রে ব'সে থেকে লাভ কি?

লাভ কি!— তারিণী মাস্টার ভাবতে লাগল। অবশেষে বলল, আচ্ছা।

কিন্তু তার দেশে যাওয়া হ'ল না। দেশে সে যাবে না, যাবার উপায় নেই। অথচ শহরে থাকা আরও অসম্ভব।

সমস্ত রাত জেগে সে উপায় চিন্তা করতে লাগল। চিন্তা করতে করতে রাত তিনটের সময় সে লাফিয়ে উঠল বিছানা ছেড়ে। সমস্যার সমাধান সে পেয়েছে। চারিদিকে ভিখারী পরিবেষ্টিত মেস্-এর বাড়িতে শুয়ে সে হঠাৎ পথ দেখতে পেল। আশ্চর্য প্রতিভা তারিণী মাস্টারের! নিজের বুদ্ধিতে সে নিজেই অবাক হয়ে গেল।

সমাধানটা সে এইভাবে ভেবেছে: আচ্ছা, ভিখারীদের সঙ্গে মিশে সে যদি বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভিক্ষে করে তা হ'লে কেমন হয়? একটা নতুন অভিজ্ঞতা লাভ হবে, খরচও লাগবে না, কেউ কিছু জানতেও পারবে না। ভিখারীর জীবন ঘৃণ্য নয়। বাঙালী হ'য়ে জন্মেছে সে, কোন বাঙালী ভিখারী নয়? কলকাতা এসে এ কথাটা সে আরও ভালভাবে উপলব্ধি করেছে এই ক'দিনে। সে যেখানে গেছে সেইখানেই ছোট, বড়, সবাই হাত বাড়িয়েছে। যেখানে তার মনে হয়েছে প্রসারিত হাতগুলো ভিখারীর নয়—দাতার, সেখানেই তার ভুল ভেঙেছে। সামান্য কাজ উদ্ধারের জন্যে প্রসারিত প্রত্যেকটি হাতে ঘুসের টাকা গুঁজে দিতে হয়েছে। ঘরে বাইরে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ হাত, দৃশ্য অদৃশ্য অল্পদৃশ্য হাত; আলোয় হাত, অন্ধকারে হাত, হাতের সংখ্যা অগণিত। মানুষের শহর নয়—শয়তানের রাজত্ব।

সেও ভিখারীর হাত নিয়েই শহরে এসেছে, পথে পথে ভিক্ষা করতে তার আর সঙ্কোচ হবে কেন?

তারিণী মাস্টার সত্যই পথের ভিখারী হল। প্রথমে এটা ছিল অভিনয় মাত্র, কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যেই অভিনয়ের কল্পিত রঙ্গমঞ্চটি ভেঙে গেল—সে স্পষ্টই দেখতে পেল, সে কখন ভিখারী-সমুদ্রের এক বিন্দু জলে পরিণত হয়েছে। এই তার দ্বিতীয় অনভ্যস্ত জগতে প্রবেশ। এখানে এসে সে শতখণ্ড হয়ে ভেঙে পড়ল। দেহটা আর চলল না। দিন পনেরো কোনো রকমে চলেছিল, ষোল দিনের দিন তার প্রবল জ্বর হ'ল এবং সেই সঙ্গে বুকে ব্যথা। পথেই এল জ্বর, পথেই মুমূর্ষু বন্ধুদের পাশে তাকে শুয়ে পড়তে হ'ল। বেহুঁশ হ'য়ে পড়ল সে। এই অবস্থায় রোদ-বৃষ্টির মধ্যে সময় যেন আর কাটে না। দুর্বল দেহে অসুখ আচম্বিতে এমন প্রবল হ'য়ে উঠল যে, কোন কিছু করার প্রবৃত্তিও আর তার রইল না!

সে শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগল।

এ সমস্তই তো ব্ল্যাক মার্কেটের কারসাজি। নইলে বাংলাদেশে চালের দুর্ভিক্ষ তো হ'তেই পারে না। ব্ল্যাক মার্কেটের লোভনীয় রূপটি সে মনের মধ্যে স্পষ্ট উপলব্ধি করল। সে ভাবতে লাগল, এত লোকের মৃত্যু—এতেই তো প্রমাণ হয় কত লোক আজ রাজা হওয়ার সুযোগ পেয়েছে; আহা ভগবান কি তার দিকে একবার মুখ তুলে চাইবেন না? এত বড় সুযোগ পেয়েও কি সে হারাবে? এই জনসমুদ্র মন্থন ক'রে ভাগ্যবানেরা অমৃত যে লুঠে নিল! সুযোগ ব'য়ে যায়—ব'য়ে যায়—হতভাগ্য তারিণী মাস্টারের শুভ সুযোগ ব'য়ে যায়।

তারিণী মাস্টার ভাবতে পারে না। উত্তেজনায় সে চারিদিক অন্ধকার দেখে। সে ভেউ ভেউ ক'রে কাঁদতে থাকে। তার যে সবই গেল। সে কি আর উঠে দাঁড়াতে পারবে না? অনুভব করতে চেষ্টা করল পায়ে শক্তি আছে কি না।

মূর্ছিত হয়ে পড়ল একটুখানি ওঠবার চেষ্টা করতেই।

জীবনী-শক্তি দ্রুত নিঃশেষ হ'য়ে এল। পকেটে দু'চারটে ভিক্ষের পয়সা ছিল, তাও গেল অলক্ষ্যে চোরের দাবী মেটাতে। গায়ের জামাটাও তার বেহুঁশ অবস্থায় কে চুরি করে নিয়ে গেছে। তার নিজেরও যাবার সময় ঘনিয়ে এল। ব্যাকরণের শিক্ষক তারিণী মাস্টারের ভাষায় বলা যায়ঃ "হি ইজ গোইং"।

কলকাতা শহরে হাজার হাজার ভিখারীর এই একই ইতিহাস। তারিণী মাস্টার তাদেরই একজন। সুতরাং তার মৃত্যুতে বৈশিষ্ট্য নেই কিছুই, কারও দুঃখ করবারও কিছু নেই; বরঞ্চ পরের সর্বনাশ ক'রে ধনী হ'তে এসে সে যে মরতে বসেছে সেটা ভালই। যারা চোর হ'য়েও বেঁচে রইল, ভবিষ্যৎ সমাজের দুশ্চিন্তা রইল তাদের জন্যই।

মুমূর্ষু তারিণী মাস্টারের মগ্ন চৈতন্যে কত স্বপ্নের স্রোত চলেছে ভেসে। সংসার বন্ধনের বহু উর্ধ্বে চলে গেছে সে।—মৃত্যুর আগে এই রকমই হয়। বাইরে থেকে সবাই ভাবে, মুমূর্ষু কি কষ্টই না পাচ্ছে। কিন্তু দৈহিক যন্ত্রণাবোধ তখন আর থাকে না—পৃথিবীর কোনো কিছুর প্রতিই তার কোনো আকর্ষণ থাকে না।

স্বপ্ন-স্রোত ক্ষীণ হ'য়ে এল। আর এক মুহূর্ত বাকী। কিন্তু তবু তার মনে হল আরও যেন কারা এসেছে তাদের শেষ দাবী জানাতে। সূক্ষ্ম চৈতন্য প্রশ্ন করল: তোমরা কে?

এ প্রশ্ন শব্দিত নয়, তাই তা কারও কানে গেল না। তারিণী মাস্টারের সূক্ষ্ম চৈতন্য তখন তার আসন থেকে উঠে চেতনার সদর দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। তার বাইরে এক পা বাড়ালেই জীবনের শেষ চিহ্নটুকু চিরদিনের জন্যে মিলিয়ে যাবে।

কিন্তু সদর দরজার বাইরে পা বাড়ানো হ'ল না। তারিণী মাস্টার বুঝতে পারল, আরও কিছু দাবী তার মেটাবার আছে।—দাবীদার এসেছে তার কাছে।

কিন্তু কিসের দাবী?

সে বুঝতে পারল শিল্পীরা এসেছে তার ছবি আঁকতে। তারা বলছে সাবজেক্টটা অদ্ভুত! ক্যামেরাধারী বলছে এর ছবি আমি এক্সিবিশনে দিতে পারব।

তারিণী মাস্টার বিষম কৌতুক অনুভব করল এদের কথা শুনে। তার ক্ষীণ চৈতন্য হো হো ক'রে হেসে ব'লে উঠল, এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গ ভরা!

কিন্তু পরক্ষণেই সে ক্ষেপে গেল। এরা তাকে বাঁচাতে আসেনি, এসেছে তার ছবি এঁকে নাম কিনতে! দূর হ, হতভাগারা দূর হ—বলতে বলতে কোন্ এক অদৃশ্য টানে সে চেতনার সদর দরজা পার হয়ে বেরিয়ে গেল, কিন্তু বেরিয়ে যেতেই হঠাৎ 'ম্যাটিনে শো' যাত্রী এক বিলাসিনীর মোটরের ধাক্কা খেয়ে একটু থমকে দাঁড়াল।

তারপর সব অন্ধকার।

(কৃষক, পূজা, ১৯৪৪)



স্বর্গীয় প্ল্যান

নারদ ব্রহ্মার কাছে বিষণ্ণ মুখে বসে আছেন। ব্রহ্মার চারিটি মুখই কিন্তু স্মিত হাস্যে উজ্জ্বল।

নারদের আশা ছিল বীণা বাজিয়ে ব্রহ্মাকে খুসী করবেন, কিন্তু এক অজ্ঞাত কারণে বীণার সুর বার বার বেসুরো হতে লাগ্‌ল, নারদ হতাশ হ'য়ে বীণাটি পাশে রেখে ব্রহ্মার কাছে ক্ষমা চাইলেন। ব্রহ্মা বললেন, আর একবার চেষ্টা কর।

নারদ আর একবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু এবারেও একটি তারে ঘা দেওয়া মাত্র সহস্র বেসুরো ঝঙ্কার একসঙ্গে বেজে উঠ্‌লো। নারদ বীণা থেকে হাত সরিয়ে বললেন, পিত ব্রহ্মা, আমি বিভ্রান্ত হয়েছি।

ব্রহ্মা বললেন, যা ঘটেছে তার অবশ্যই কারণ আছে।

নারদ লজ্জিত ভাবে বললেন, আমি তো এর কারণ বুঝতে পারছি না। ব্রহ্মা হেসে বললেন, বীণা বেসুরো বাজার কারণ হ'চ্ছে তোমার দাড়ি এবং তোমার বসার ভঙ্গী। চেয়ে দেখ, তুমি তোমার দাড়ির অগ্রভাগ হাঁটুর নীচে এমন টেনে এবং চেপে বসেছ যে প্রত্যেকটি দাড়ি তারের গুণ লাভ করেছে, সুতরাং বীণার তারের প্রত্যেকটি ঝঙ্কার তোমার দাড়িতে প্রতিঝঙ্কৃত হ'য়ে সবসুদ্ধ সুর বিভ্রাট ঘটিয়াছে।

নারদ এই অভাবিত ঘটনা চকিতে হৃদয়ঙ্গম ক'রে বিষম কৌতুক অনুভব করলেন, কিন্তু চাপল্য প্রকাশ হওয়ার ভয়ে হাসতে পারলেন না।

এমন সময় চিত্রগুপ্ত এসে পড়ায় নারদ যেন একটা বিপদ থেকে বেঁচে গেলেন। চিত্রগুপ্ত বললেন, পিত ব্রহ্মা, আমি পিতা যমের কাছ থেকে মাসখানেকের ছুটি আদায় করেছি, ভাবছি একটা মাস সম্পূর্ণ বিশ্রাম নেব। আর—কিন্তু কথাটি শেষ হবার আগেই চমকিত হ'য়ে সবাই কান খাড়া করলেন।

স্বর্গের তোরণ দ্বারে কড়া নাড়ে কে?

—নারদ!

নারদ একলাফে উঠে পড়লেন এবং কটিদেশে কাপড় কষে নিয়ে আদেশ পালনের জন্যে উদ্যত হ'লেন।

ব্রহ্মা বললেন, তুমি থাকো। চিত্রগুপ্ত—তুমি দেখে এসো কে এল বিরক্ত করতে।

চিত্রগুপ্ত চকিতে অন্তর্হিত হ'লেন।

চিত্রগুপ্ত একটু পরেই ফিরে এসে বললেন, পৃথিবী থেকে দুজন লোক এসেছে। তারা স্বর্গের প্ল্যান জানতে চায়।

কেন?

পৃথিবীতে এখন যে যুদ্ধ হচ্ছে তাতে সব ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, তাই যুদ্ধ শেষে তারা আবার সব নতুন ক'রে গড়বে।

তা হ'লে এখানে হল্লা করছে কেন?

আজ্ঞে তারা সবাই পোস্ট ওয়ার প্ল্যান তৈরি করছে।

আমার কথার উত্তর দাও, এখানে তারা কি চায়?

বলছে, তারা স্বর্গ রচনা করবে পৃথিবীতে।

স্বর্গ সম্বন্ধে তাদের ধারণা উঁচু দেখছি।

ওরা সম্ভবত মনে করেছে এখানে দুঃখ দৈন্য নেই, শোকতাপ নেই—এখানে সবই ভাল।

ব্রহ্মা শুধু বললেন, হুঁ। তারপর বললেন, আচ্ছা, ওদের অপেক্ষা করতে বল।

চিত্রগুপ্ত চলে গেলেন।

ব্রহ্মা নারদকে বললেন, এইবার তুমি ওদের কাছে গিয়ে স্বর্গ সম্বন্ধে ওদের একটা মোটামুটি ধারণা করিয়ে দাও।

যথা আজ্ঞা বলে নারদও অন্তর্হিত হ'লেন।

পৃথিবীর দুজন লোক, একজন ইংরেজ, একজন মার্কিন। তারা নারদকে বলল, আমাদের বড্ড দেরি হ'য়ে যাচ্ছে, স্বর্গের প্ল্যানটা চট্‌পট্ দেখিয়ে দিন তো।

নারদ বললেন, এসো আমার সঙ্গে। ইংরেজ ও মার্কিন কয়েক পা এগিয়ে গেল নারদের সঙ্গে।

এই তোরণের ভিতর থেকেই স্বর্গ আরম্ভ। এইখান থেকেই দেখতে থাক।

দুজনেই বলে উঠল, আমরা ত কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।

নারদ চিত্রগুপ্তকে ডাকলেন।

দুটি মানুষকে তোরণের বাইরে নিয়ে যাও।

লোকদুটি বাইরে এসেই বলল, কোন্ দিকটা স্বর্গ বুঝতে পারছি না তো।

চিত্রগুপ্ত বললেন, এখন তোমরা স্বর্গের বাইরে এসেছ।

—তা হ'লে ঐ শূন্য স্থানকেই আপনারা স্বর্গ বলেন?

—হ্যাঁ ওকেই বলি, কিন্তু ওখানে তোমরা কিছু দেখতেও পাবে না, শুনতেও পাবে না।

কেন?

নারদ এ কথার জবাবে বললেন, স্বর্গ সম্বন্ধে তোমাদের ধারণা কি?

মার্কিন নারদের অভদ্রতায় ক্ষুণ্ণ হল এবং কড়াস্বরে বলল, ধারণা খুব স্পষ্ট নয়।

ইংরেজ বলল, আমরা স্বর্গকে আদর্শ জায়গা বলে বিবেচনা করি। এখানে কোনো সমস্যা নেই, কোনো দুঃখ নেই, শোকতাপ নেই, সবই এখানে আলো, সবই এখানে মধুর।

নারদ প্রশ্ন করলেন, বিজ্ঞান বোঝ?

ইংরেজ বলল, কিছু কিছু বুঝি বৈকি।

তা'লে বুঝে দেখ, স্বর্গে যদি সবই আলো, কোথায়ও কোনো ছায়া না থাকে, আলোর অভাব না থাকে, তা হ'লে কোনো বস্তু তোমরা দেখবে কি করে?

মার্কিন কথাটা একটু ভেবে বলল, তা হ'লে আপনার মত এই যে এখানে ছায়া নেই। কিন্তু ছায়া না থাকলেও রং তো থাকতে পারে?

না, তাও নেই। এখানে কোনো বস্তু কোনো আলোক রশ্মি হজম করে না, প্রতিফলিতও করে না—এখানে সব আলোই সব বস্তুকে ভেদ করে যায়। সুতরাং স্বর্গ সম্বন্ধে তোমাদের ধারণা ঠিক হ'লেও স্বর্গ দেখতে পাওয়া যাবে এই ধারণাটা তোমাদের ভুল হ'য়েছে।

মার্কিন বলল, মনে হচ্ছে হয়েছে কিন্তু উপায় কি?

নারদ বললেন, কাজেই এখানে তোমরা কিছু দেখতে পাবে না। তারপর তোমরা বলেছ এখানে সবই মধুর। একথাও সত্য। অন্য কোনো স্বাদ নেই কেবল মধুর স্বাদ। সুতরাং সেটা যে কি তা তোমরা বুঝতে পারবে না। তারপর ভেবে দেখ, এখানে ব্যাধি নেই, মৃত্যু নেই,—এই বার বল তার ফল কি হ'তে পারে?

ইংরেজ বলল, এইটেই তো চাই আমরা।

চাও আপত্তি নেই, কিন্তু লাভ কি?

সেটা আমরা বুঝব।

আচ্ছা তা হ'লে চির অবিমিশ্র সুখের স্বাদটা তোমাদের পাইয়ে দিই। চিত্রগুপ্ত—

প্রভু—

এদের সুখের রাজ্যে নিক্ষেপ কর।

এসো তোমরা আমার সঙ্গে।

চিত্রগুপ্ত ইংরেজ ও মার্কিনকে স্বর্গীয় সুখের রাজ্যে নিক্ষেপ ক'রে নারদের কাছে ফিরে আসতেই নারদ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা স্বর্গীয় সুখের স্বাদ পেলে ওরা কি আরও স্বর্গীয় সুখ চাইবে?

বলা যায় না। মানুষ বড় ধূর্ত।

তা হোক না ধূর্ত। ওদের মজা কি জান? ওরা কি চায় তা ওরা ঠিক জানে না। তা ছাড়া সুখ দুঃখের অর্থও ওরা ঠিক বোঝে না।

—না প্রভু, আমার বিশ্বাস, কিছু কিছু বোঝে। তবু ওরা এখানে এসেছে এখানকার কোনো শক্তি হরণ করতে। তা ছাড়া সুখ যদি এখানে সত্যই মিলত তা হ'লেও ওরা তা সবার জন্যে চাইত না। পৃথিবীতে স্বর্গরচনা করা একটা ভাঁওতা মাত্র।

কেন বল তো ?

কারণ সবাই সমান সুখী হ'লে ওদের ক্ষমতা প্রকাশের সুযোগ নষ্ট হ'য়ে যাবে, ওরা অধীন ক'রে রাখবে কাকে ?

নারদ দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বললেন, তা হ'লে পোস্ট ওয়ার প্ল্যানের কোনো মানে নেই ?

চিত্রগুপ্ত বললেন, ঐ একটি মাত্র মানেই ওর আছে। কতকগুলো লোক তাদের প্ল্যানের সাহায্যে আর কতকগুলো লোককে অধীন করে রাখবে।

প্ল্যান কথাটির মানে কি গুপ্ত ?

প্ল্যান মানে পরিকল্পনা।

আর কোনো মানে নেই ?

আজ্ঞে, অক্সফোর্ড খুলব ?

না। আমি জানি। ওর আর এক মানে হচ্ছে ষড়যন্ত্র।

প্রভু, তা হ'লে স্বর্গীয় দেবতাদের মধ্যে যে সব রীতি প্রচলিত তা আর ওদের জানাব না।

না। ওদের কেবল স্বর্গের ভূগোল দেখাও, ইতিহাস শিখিও না। স্বর্গ সম্বন্ধে ওদের মোহ সম্পূর্ণ ভেঙে দাও। ডাক ওদের।

আর কারও সাহায্য দরকার হবে না, ওরা নিজেরাই স্বর্গসুখে বিমুখ হবে। আচ্ছা আমি ওদের সুখের রাজ্য থেকে উদ্ধার করে আনি।

চিত্রগুপ্ত চলে গেলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মা এসে হাজির হ'লেন নারদের কাছে।

বাবা নারদ, কি করছ এখানে ?

চিত্রগুপ্তকে পাঠিয়েছি মানবদ্বয়কে সুখরাজ্য থেকে উদ্ধার করে আনতে, কিছুক্ষণ হ'ল তারা সেখানে নিক্ষিপ্ত হ'য়েছে।

দেখা গেল চিত্রগুপ্তের সঙ্গে মার্কিন তর্ক করতে করতে আসছে। সে বলছে, সুখ রাজ্যের নাম ক'রে আমাদের ঠকিয়েছেন।

নারদ সে কথা শুনে বললেন, ভদ্রভাবে কথা বল।

মার্কিন বলল, ভদ্রভাবে বললেও এই কথাই বলতে হয় যে আমরা যা চেয়েছিলাম তা আপনারা দিচ্ছেন না।

কি চেয়েছিলে ?

সুখের অভিজ্ঞতা।

তাই পেয়েছ। এক-টানা চরম সুখ তোমরা এতক্ষণ ভোগ করলে।

আমরা কিছুই ভোগ করিনি, মূর্ছিত হয়ে ছিলাম। কিছুই আমাদের মনে পড়ছে না।

ওকেই এক-টানা অবিমিশ্র সুখ বলে। ওটা মৃত্যুরই সমান। এখানকার কোনো জিনিসই তোমরা দেখতে পাবে না, বুঝতে পারবে না, শুনতে পাবে না, স্পর্শ করতে পাবে না। ঘ্রাণ এবং স্বাদও কিছুর পাবে না, এবং সে কথা আগেই বলেছি। আলোর সঙ্গে ছায়া না থাকলে, সুখের সঙ্গে দুঃখ না থাকলে কোনোটারই অর্থ হয় না।

কিন্তু স্বর্গীয় সঙ্গীত, স্বর্গীয় আনন্দ, এ সব কথা শুনি কেন?

ও সব কল্পনা, এবং সেও অতি নিম্ন শ্রেণীর কল্পনা, কেননা মূর্খের কল্পনা। ওর আসল মানে হচ্ছে মৃত্যু।

ইংরেজ বলল, কিন্তু কিছু সন্দেহ এখনও আমাদের মনে রয়ে গেল।

মার্কিন বলল, আমি এতক্ষণে নিঃসন্দেহ হয়েছি। অবিমিশ্র সুখ এক-টানা কখনই থাকতে পারে না। কথাটা আমি উপলব্ধি করেছি এবং খুশী হয়েছি।

নারদ বললেন, তোমরা বিজ্ঞানের সহায্যেই তো এটা বুঝতে পার, এখানে কষ্ট ক'রে এলে কেন?

ইংরেজ বলল, আপনার কথা না হয় মেনে নিলাম, কিন্তু এমনও তো হতে পারে যে স্বর্গ সম্বন্ধে আমাদের যে কল্পনা সেটা মিথ্যা, কিন্তু স্বর্গটা মিথ্যা নয়।

মার্কিন বলল, তোমার কথাটা ভাল বোঝা গেল না। স্বর্গ মিথ্যা নয় বলেই তো স্বর্গে আসতে পেরেছি।

ইংরেজ বলল, তা নয়, আমি বলছি আমরা যে অবস্থাকে স্বর্গীয় অবস্থা ব'লে কল্পনা করি, সেই রকম স্বর্গই হয়তো আছে, হয়তো সেখানে এক-টানা সুখ আছে, সেখানে সবই আলো, সবই সুন্দর—অথচ তা আমরা উপভোগও করতে পারব।

চিত্রগুপ্ত নারদের কানের কাছে মুখ নিয়ে চাপা সুরে বললেন, এই লোকটা অতি ধূর্ত।

নারদ বললেন, ইংরেজ কি না!

চিত্রগুপ্ত ইংরেজকে বললেন, সে স্বর্গ তোমাদের মনেই আছে, বাইরে নেই।

ইংরেজ নারদের দিকে চেয়ে বলল, আপনিও কি তাই বলেন?

অবশ্যই বলি।

মার্কিন খুব খুশী হয়ে পকেট থেকে একটা চুরুট বের ক'রে নারদকে 'অফার' করল। নারদ তা প্রত্যাখ্যান করলেন।

মার্কিন বলল, ও! চুরুট অভ্যাস নেই বুঝি?

চিত্রগুপ্ত বললেন, তামাক উনি খেয়ে থাকেন, কিন্তু তার কল্কে থাকে বহু দূরে। চুরুট ধরাতে দাড়িতে আগুন জ্বলে যেতে পারে।

ইংরেজ বললেন, আচ্ছা এমন একটা প্ল্যান কি করা যায় না যাতে মানুষের দুঃখ অনেকটা কমতে পারে?

নারদ বললেন, দুঃখ যত কমাবে সুখও তত কমে যাবে। এখানে যেমন অন্ধকারও নেই, আলোও নেই।

মার্কিন বলল, সুখ একটু কমলে আপত্তি নেই···কিন্তু···

কিন্তু কি?

আপনি একটু অন্তরালে আসুন, আসল কথাটা আপনাকে বলি।

ইংরেজ এ প্রস্তাবে আপত্তি করল। কিন্তু গোপন কথা শোনায় নারদেরই আগ্রহ এত বেশি দেখা গেল যে ইংরেজের আপত্তি টিকল না।

অন্তরালে গিয়ে মার্কিন বলল, এমন একটা সহজ প্ল্যান কি হয় না যাতে দুঃখী লোক মনে করবে তারা খুব সুখে আছে?

নারদ আশা করেছিলেন নতুন ধরণের কোনো গোপন কথা শুনতে পাবেন, তাই তিনি এ কথায় অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বললেন, যা তোমরাই পার তা নিয়ে এত দূর এসেছ আমাদের বিরক্ত করতে! তোমার উদ্দেশ্য কি?

একটা ভাল প্ল্যান পেলে সেটাকে পেটেণ্ট ক'রে ফেল্‌তে চাই।

তার মানে?

তার মানে, তাতে আর কারও অধিকার থাকবে না। তার অনুকরণ আর কেউ করতে পারবে না। উপরন্তু আমার মোটারকমের লাভ হবে।

নারদ স্তম্ভিত হয়ে বললেন, তা হ'লে এই চাও তোমরা?

'তোমরা' বলবেন না, কেননা আমি একা চাই।

যা চাও তা পাবে না।

যা চাই তা পেয়েছি।

কি পেয়েছ?

আমি জানতাম পৃথিবীতে শান্তিপ্রতিষ্ঠা অসম্ভব।

তবে এখানে এসেছ কেন?

সন্দেহ ছিল, হয়তো স্বর্গের প্ল্যান কেউ মেরে দিয়ে পৃথিবীতে চির শান্তি প্রতিষ্ঠা করবে। তাই দেখতে এসেছি তা' আদৌ সম্ভব কি না। দেখলাম সম্ভব নয়, তাই খুশী হয়েছি। আমাদের ডেমোক্রেসি রক্ষা হ'ল।

কেন?

চির শান্তি প্রতিষ্ঠা হ'লে পৃথিবীতে আর যুদ্ধ হবে না, সে আমাদের পক্ষে কতখানি মারাত্মক তা আপনি বুঝবেন না।

বুঝতে পারছি না সত্যিই।

আমাদের ভবিষ্যৎ উন্নতি নির্ভর করছে এর উপর। যুদ্ধ না হ'লেই আমরা বেকার—ডেমোক্রেসির মৃত্যু।

এই সময় মানুষের অলক্ষ্যে ব্রহ্মা সেখানে উপস্থিত হয়ে নারদকে চুপে চুপে বললেন, স'রে পড় পুত্র, স'রে পড়।

নারদ অকস্মাৎ অদৃশ্য হলেন, সঙ্গে সঙ্গে সব কিছু শূন্যে মিলিয়ে গেল।

ব্রহ্মা নারদকে বলছিলেন, চিত্রগুপ্ত একমাসের ছুটি পেয়েছে, ওকে আর বেশি খাটানো উচিত নয়। যম হয়তো মনে কিছু করতে পারে।

নারদ তার উত্তরে বললেন, সে তো বটেই।

চিত্রগুপ্ত বললেন, না তিনি কিছু মনে করবেন না।

এমন সময় স্বর্গের তোরণে আবার কড়া নড়ে উঠল।

নাঃ আজ সবাই জ্বালালে দেখছি, ব'লে ব্রহ্মা স্থান ত্যাগ করলেন।

নারদ চিত্রগুপ্তের দিকে তাকাতেই, চিত্রগুপ্ত এগিয়ে গেলেন তোরণের দিকে। দরজা খুলে প্রশ্ন করলেন, কে?

আমি মানুষ।

ওটা সম্পূর্ণ পরিচয় নয়।

আমি সমাজতান্ত্রিক।

আরও খুলে বল।

আমি ভট্টাভিস্কি। শুনেছি এখানে এক্সপ্লয়টেশন নেই, সব্বাই এখানে সুখী।

ধর, যদি তাই হয়?

তা হ'লে এখানকার প্ল্যান আমার কাজে লাগবে, আপনাদেরও ফি ফাইভ-ইয়ার প্ল্যান।

না, এখানে সব কিছু বিশ্বকালীন।

সেটাও দেখা দরকার।

উদ্দেশ্য ?

পৃথিবীতে মডেল স্বর্গ সৃষ্টি করব।

সবারই দেখছি এক কথা। এখানকার প্ল্যান পেটেণ্ট করতে চাও ?

সমস্ত পেটেণ্ট রীতির উচ্ছেদই আমার কাম্য।

কথাটা নতুন শোনাচ্ছে বটে।

তা হয়তো শোনাচ্ছে, কিন্তু বিশ্বাস করুন, এখানে যদি কিছু পাই তা হ'লে তাতে সব মানুষের সমান অধিকার থাকবে, ভুলবেন না আমি সমাজতান্ত্রিক, মানব সমাজের উন্নতি আমার লক্ষ্য।

তোমার উদ্দেশ্য স্পষ্ট ক'রে বল।

আমি সমস্ত পৃথিবীতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চাই।

সমস্ত পৃথিবীতে ?

হ্যাঁ। হ'লে কি ভাল হয় না ?

তোমাদের ভাল আর আমাদের ভালয় অনেক তফাৎ। এ বিষয়ে আমাদের মত তোমাদের কোনো কাজে লাগবে না।

চিত্রগুপ্তের বিলম্ব দেখে নারদ বিরক্ত ভাবে ছুটে এসে বললেন, এর সঙ্গে বেশি কথা কাটাকাটি ক'রো না, যা করবার মুহূর্তে শেষ ক'রে ফেল।

চিত্রগুপ্ত বললেন, ইনি ভট্টাভিস্কি, পৃথিবীতে ইনি সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চান।

পারবে না।

কেন ?

অনেকে আপত্তি করবে।

আপত্তি করবে কেন ?

আগে সমাজতন্ত্র মানে কি বল, পরে বুঝিয়ে দেব কেন আপত্তি করবে।

সমাজতন্ত্র মানে এমন একটা ব্যবস্থা যার ফলে কেউ আর বসে বসে অপরের শ্রমলব্ধ জিনিসে ভাগ বসাতে পারবে না। দেশের সম্পদে সবারই সমান অধিকার থাকবে। ব্যক্তিগত মুনাফার জন্যে কেউ কারখানা বা ব্যবসা চালাতে পারবে না। তা ছাড়া—

নারদ কথাটা মাঝ পথে থামিয়ে দিয়ে বললেন, গুপ্ত—

প্রভু—

একে এক এক ক'রে আমাদের মডেল পল্লীগুলোয় নিক্ষেপ কর।

প্রথমে কোথায় করব ?

প্রথমে কর মডেল বঙ্গপল্লীতে।

চিত্রগুপ্ত যথানির্দিষ্ট ভট্টাভিস্কিকে স্বর্গীয় বাঙালী-পাড়ায় নিক্ষেপ ক'রে এলেন।

ভট্টাভিস্কি দেখল স্থানটা স্বর্গের ঠিক ভিতরে নয়, স্বর্গের সংলগ্ন, তাই এখানে সব কিছুই পার্থিব জগতের মতোই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। সে প্রথমেই গেল শ্রমিকদের অবস্থা দেখতে।

ভট্টাভিস্কি শ্রমিকদের সঙ্গে আলাপ ক'রে স্তম্ভিত হ'ল—তারা কেউ বাঙালী নয়। তবে কি তাকে ভুল ক'রে অন্য কোথাও পাঠানো হ'ল? কিন্তু সন্ধান নিয়ে জানতে পারল, ভুল নয়, এটা বঙ্গপল্লীই বটে। তারপর সে গেল বস্তীতে। গিয়ে দেখল সেখানেও বাঙালী কেউ নেই।

তারপর সে আবিষ্কার করল, ধোপা, নাপিত, কুলি, গাড়োয়ান, ফেরিওয়ালা, চাকর, দারোয়ান কেউ বাঙালী নয়। কারণ জিজ্ঞাসা করে জানা গেল বাঙালীরা কেউ ছোট লোকের কাজ করে না।

একটু এগিয়ে শহরের দিকে গিয়ে ভট্টাভিস্কি দেখতে পেল পথে পথে ভিখারীর ভিড়, অনেকে মাটিতে পড়ে ক্ষুধার তাড়নায় ছটফট করছে, অনেকে মরেই গেছে। সে সবিস্ময়ে জানতে পারল এরাই বাঙালী।

একজন বিদেশীকে দেখে ভিখারীরা তাকে ঘিরে ধরল। ভট্টাভিস্কি প্রশ্ন করল, তোমরা ভিক্ষে করছ কেন?

দেশে দুর্ভিক্ষ লেগেছে সাহেব।

দুর্ভিক্ষ লেগেছে তা হ'লে এত লোক বেঁচে আছে কি করে? কুলিরা পর্যন্ত দিব্যি স্বাস্থ্য নিয়ে মোট বয়ে বেড়াচ্ছে।

ওরা বিদেশী লোক সব পারে, তাই ব'লে আমরা কি ঐ সব কাজ করতে পারি? মলেও না।

আপাতত প্রাণটা তো বাঁচানো দরকার?—তোমরা এত মেয়ে পুরুষ কারুর বাড়ি ঝি চাকরের কাজ করলেও তো পার?

ভিখারীদের মধ্যে একজন বৃদ্ধ ছিল, সে বলল, সাহেব, কোনো পুরুষে আমরা চাকর নই। আজ দুর্ভিক্ষ হ'য়েছে, দুদিন না খেয়ে ভিক্ষে ক'রে কোনো রকমে কটা দিন কাটিয়ে দিতে পারলেই বাস্, আবার আগের অবস্থায় ফিরে যাব। কিন্তু ঐ সব ছোট লোকের কাজ করলে চিরদিনের মতো জাত যাবে, ও আমরা কিছুতেই পারব না।

দুটো পয়সা দাও না সাহেব।—এক ভিখারী এসে হাত পাতল।

না, কাজ না করলে এক পয়সাও না।

যাও যাও সাহেব, ভিক্ষে দিতে হবে না। তাহলাম দুটো পয়সা, উল্টে আরও অপমান করছেন!

কাজ না হ'লে তোমরা করবে না?

ছোট লোকের কাজ করব না।

পাশ দিয়ে হিন্দুস্থানীরা স্ফূর্তির সঙ্গে ঠেলাগাড়িতে ক'রে মাল ঠেলে নিয়ে চলেছে। তাদের পেশীপুষ্ট দেহের দিকে ভট্টাভিস্কি সবিস্ময়ে চেয়ে রইল।

বাঙালী পল্লীর বাঙালীরা কি তা হ'লে কর্মবিমুখ?

ভট্টাভিস্কির মাথায় এক দুষ্ট বুদ্ধির উদয় হ'ল।

সে দাঁড়িয়ে বক্তৃতার ভঙ্গীতে বলতে লাগল, 'আমি তোমাদের দুরবস্থা দেখে অত্যন্ত দুঃখ পেয়েছি। তাই তোমাদের জন্যে একটা কাজ করতে চাই। এ দেশে আমি একটা আশ্রম গড়ব। সেখানে তোমরা সবাই বিনা পয়সায় থাকতে পাবে, খেতে পাবে, কাউকে কোনো কাজ করতে হবে না। সেখানে থাকার কোন সর্ত নেই, ইচ্ছে হ'লেই থাকতে পারবে।'

সবাই সমস্বরে চেঁচিয়ে বলে উঠল, সত্যিই?

ভট্টাভিস্কি বলল, সাত দিনের মধ্যে আশ্রম গড়ব।

ভিখারীরা আনন্দে কলরব ক'রে উঠল। খবরটা মুহূর্তে আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়ল সমস্ত বঙ্গপল্লীতে। লক্ষ লক্ষ বাঙালী বেরিয়ে এল ঘর থেকে, অফিস-থেকে, দোকান থেকে। দেখা গেল সমস্ত বাঙালী আশ্রমে থাকার জন্যে প্রস্তুত। তারা আর দেরি করতে রাজি নয়।

আনন্দে গদগদ হ'য়ে সবাই বলতে লাগল, এতদিনে এ দেশে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠা হ'ল। এতদিনে স্বপ্ন সফল হ'ল। এতদিনে জীবন সার্থক হ'ল।

এক দল প্রশ্ন করল, আশ্রম গড়তে কি আমাদেরও সাহায্য দরকার হবে?

না, কারুর সাহায্যের দরকার হবে না।

এ কথায় তারা একেবারে অভিভূত হ'য়ে পড়ল। যারা সারা জীবন শুয়ে শুয়ে কাটাচ্ছিল তারাও উৎসাহের সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে এল এ কথা শুনে।

ভট্টাভিস্কি ভাবল, আর কেন?

সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য চিত্রগুপ্ত ভট্টাভিস্কিকে উদ্ধার করে নিয়ে গেলেন মডেল বঙ্গপল্লী থেকে।

নারদ স্মিত হাস্যে প্রশ্ন করলেন, কি রকম মনে হ'ল?

ভট্টাভিস্কি বিমর্ষ ভাবে বলল, ওদের আলাদাই রাখতে হবে দেখছি।

শুধু ওদের নয়, আরও অনেককে। নমুনা এক রকম দেখেই উৎসাহিত
া না।

এর কি কোনো প্রতিকার নেই?

স্বয়ং ব্রহ্মাই অনেক ভেবেছেন, কিন্তু কূল কিনারা পান না। ওরা বহুবার এসেছে অমৃত ভিক্ষা করতে, কিন্তু ও জিনিস তো আর কাউকে ভিক্ষা দেওয়া যায় না!

ওরা অদ্ভুত!

বঙ্গপল্লীর লোকরা তো? আমি দেখেছি দুটি রাজ্যে ওরা বাস করে। একদল বাস করে ভাবের রাজ্যে, আর একদল বাস করে অভাবের রাজ্যে। ভাবের রাজ্যে যারা থাকে তারা শুধু কাব্য রচনা করে, খায় না। অভাবের রাজ্যে যারা থাকে তারা ভিক্ষা করে, খেতে পায় না।

এ রকম আরও মডেল পল্লী আছে এখানে?

অনেক।

ওদের কথা থাক।

কিন্তু ওদের কথাতেই তো আমার জবাব।

তা হ'লে স্বর্গের প্ল্যান—

সেটা স্বর্গেই থাক।

ও! আচ্ছা তা হ'লে বিদায়।

ভট্টাভিস্কি চলে যাওয়ার পর ব্রহ্মা নারদের চাতুর্যে খুশী হ'য়ে বললেন, ভবিষ্যৎ ব্রহ্মার পদটি তোমার জন্যেই রিজার্ভ রইল। চিত্রগুপ্তকে বললেন, তোরণ দ্বারের কড়া দুটো খুলে রাখ।

(গল্পভারতী, ১৯৪৫)



সাহিত্য ও গাওয়া ঘি

কলিকাতা সাহিত্য-বৈঠকের সাপ্তাহিক অধিবেশনে আজ সাহিত্যের আদর্শ নিয়ে একটা বিতর্কমূলক আলোচনা হবে।

বৈঠক বসবে সন্ধ্যা সাতটায়, কবি সুহৃৎ ভট্টাচার্যের বৈঠকখানায়। শহরের নবীন প্রবীণ অনেক সাহিত্যিকই আজ তাঁদের মতামত ব্যক্ত করবেন।

সন্ধ্যা ছটা থেকেই সাহিত্যিকরা আসতে শুরু করেছেন, সভাপতি

জনপ্রিয় লেখক সত্যেন তালুকদার; তিনি কথা দিয়েছেন, ঠিক সাতটায় আসবেন।

কিন্তু ইতিমধ্যেই আসরে তর্ক আরম্ভ হয়ে গেছে। এক কথা দু'কথা থেকে আলোচনা বেশ জমে উঠেছে। সাহিত্যের আদর্শ সম্বন্ধে সৌন্দর্যের পূজারী দ্বিজু সেন তাঁর মতটি সভা আরম্ভ হওয়া পর্যন্ত চেপে রাখতে পারেননি। দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁর পাশেই বসেছিলেন তাঁর বিরোধী ললিত দত্ত। সহসা নিম্নলিখিতরূপ আলোচনাটি সবাই শুনতে লাগলেন:

ললিত দত্ত বলছেন, মশাই, মানুষের সুখদুঃখ, মানুষের আশাভরসা যাঁর লেখায় ফুটবে তিনিই বড় লেখক, অন্ততঃ এ যুগের বড় লেখক।

দ্বিজু সেন বাঁকা ভাবে বললেন, ও কথার কোনো মানে হয় না। যে মানুষই হোক, তার চরিত্র যদি ঠিক মতো ফোটে এবং গল্প যদি গল্প হয় তা হ'লেই হ'ল। আর সংসারে মানুষই সব নয়, পশুপাখী এবং বিশ্বপ্রকৃতিও আছে।

আলোচনার ভঙ্গী দ্রুত গুরুতর আকার ধারণ করল। ললিত দত্ত চুপ ক'রে থাকার পাত্র নন, তিনি বললেন, গল্পের মধ্যে মানুষ শুধু ব্যক্তি বা শুধু চরিত্র হিসাবে থাকলেই হবে না, মশাই।

তার মানে?

তার মানে সে মানুষ যে-সমাজে থাকে সেই সমাজের রূপ তার পিছনে থাকা চাই। নইলে সে হবে রূপকথা। তা ছাড়া ধনিকের যে আদর্শ, তার যা ভাল লাগে, গল্পের মধ্যে সে যে উপভোগ্য জিনিস পেতে চায়, এতকাল তাকেই আমরা বলে আসছি বিশুদ্ধ সৌন্দর্য।

দ্বিজু সেন বিদ্রূপের ভঙ্গীতে হেসে বললেন, অর্থাৎ কম্যুনিজম না হ'লে সাহিত্য হবে না? প্রপাগাণ্ডা না হ'লে সাহিত্য হবে না?

সুহৃৎবাবু বিপদ আশঙ্কা ক'রে বললেন, আপনারা একটু অপেক্ষা করুন, এ সব আলোচনা পরে হবে।

কিন্তু তাতে কোনো ফল হ'ল না। গলা দুজনেরই আরও চড়ে গেল। ললিত বাবু বললেন, দুঃখী মানুষের দুঃখ বেদনার কথা সাহিত্যে ফুটলেই কি তাকে বলবেন প্রপাগাণ্ডা?

মশাই, মানুষের দুঃখ চিরস্থায়ী নয়, কিন্তু মানুষের মনে যে সুন্দরের স্বপ্ন আছে, সে স্বপ্ন চিরস্থায়ী। আজ ফুলের কাব্য দুর্ভিক্ষের জন্যে ভাল না লাগতে পারে, কিন্তু দুর্ভিক্ষ ঘুচলেই ভাল লাগবে। তবু আপনি বলবেন ফুলের কাব্য, কুকাব্য?

সুহৃৎবাবু ইতিমধ্যে চা পাঠিয়ে দিয়েছেন, আশা ছিল তর্কটা সাময়িকভাবে বন্ধ থাকবে, কিন্তু তাতেও কিছু হল না। চা খেতে খেতেই ললিতবাবু বলতে লাগলেন, অর্থাৎ মানুষের জীবনের সুখদুঃখটা সাময়িক ব'লে উড়িয়ে দিয়েই মনে করলেন সাহিত্যের উদ্দেশ্যটাই উড়িয়ে দেওয়া গেল! মশাই, আজকের মানুষের বিরাট দুঃখবেদনা সে সাহিত্যিকের মনে সাড়া জাগাল না, যে লেখক দুঃখী মানুষকে ডেকে বলল না আমি তোমারই কবি; যে শুধু চোখ বুজে, বাস্তব পরিবেশের স্পর্শ-মুক্ত অ্যাবস্ট্রাক্ট নীতির সাহায্যে, ল্যাবরেটরিতে ব'সে, বাস্তবের নির্যাস নিষ্কাষণ ক'রে মনে করল অমর সৌন্দর্য সৃষ্টি করছে, তার সাহিত্য তা হলে কোনো অনিশ্চিত সুখদুঃখাতীত দিনের জন্যে বাক্সবন্দী করে রাখাই ভাল।

দ্বিজু সেন আরও উত্তেজিত হয়ে উঠলেন এ কথায়। বললেন, বাজে কথা বলছেন আপনি। তা হ'লে আপনার মতে একমাত্র আলু পটোল আর ধানের মধ্যেই আনন্দ খুঁজতে হবে? প্রকৃতি ফুল ফুটিয়ে তা হলে বড্ড ভুল করেছে!

ললিত দত্ত বললেন, অন্ধ প্রকৃতির সঙ্গে বিচারী মানুষের উপমা চালিয়ে আপনি ফাঁকা তর্ক করছেন। প্রকৃতি কেন ফুল ফুটিয়েছে, এবং প্রকৃতি কেন কেউটে সাপ সৃষ্টি করেছে তা আমরা জানি না। তা ছাড়া—

সুহৃৎবাবু কথার মাঝখানেই জোড় হাতে বললেন, দোহাই আপনাদের, একটু থামুন।

ললিত দত্ত বললেন, থামব কি মশাই, দেখছেন না ভদ্রলোক যা-তা বলছেন। উনি বলছেন, মন নিষ্ক্রিয়ভাবে কেবল চোখ খুলে প্রকৃতির শোভা দেখবে, অথচ সে যাদের মধ্যে বাস করছে সেই সব মানুষের কথা তুললেই বলবে ওটা সাহিত্যের বিষয়বস্তু নয়! অর্থাৎ মানুষের জন্যে সমবেদনা প্রকাশের কাজটা নাকি একমাত্র রাশিয়ার একচেটিয়া, ওটা না কি এদেশে চলবে না।

দ্বিজু সেন উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে বললেন, বাস, আর তর্ক করে ফল নেই, আপনি স্বীকার করেছেন, আপনাদের সাহিত্য রাশিয়ার নকল।

ললিত দত্ত সে কথায় কান না দিয়ে বললেন, এইসব স্থবিরদের সঙ্গে তর্ক করা বৃথা। ওঁরা জানেন না যে এখন লোকের দৃষ্টিভঙ্গী বদলে গেছে।

তা হলে চিরন্তন বলে কিছু নেই?

আছে বৈ কি। কিন্তু কোন্‌টা যে চিরন্তন তা জোর করে বলা যায় না। চিরন্তন যদি কিছু থাকে তবে সে হচ্ছে সাহিত্যের উদ্দেশ্য; কিন্তু সাহিত্যের ভাষা, সাহিত্যের দৃষ্টিভঙ্গী, সাহিত্যের বিষয়বস্তু, বার বার বদলাবে। সাহিত্যের যেটা

উদ্দেশ্য; সাহিত্য যুগে যুগে সেই উদ্দেশ্য সফল করছে। অতএব দ্বিজু সেনের সঙ্গে আমাদের মতভেদ ঘুচল না।

দ্বিজু সেন কথাটা হেসে উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলেন এবং হাসি থামলে বললেন, সেটা আমার সৌভাগ্য।

ললিতবাবুও হেসে বললেন, একটি কথা মনে রাখবেন দ্বিজুবাবু, সাহিত্যে এখন আমরা চাই আমাদের নব চেতনা এবং নব উপলব্ধির প্রকাশ।

কিসের নব চেতনা? ব'লে দ্বিজু সেন এমন ভাবে হাত নাড়লেন যে সামনের ট্রে থেকে চায়ের কতকগুলো কাপ এক ধাক্কায় ঝন্-ঝন্ করে ভেঙে গেল। এই কাপ-ভাঙার শব্দ যেন নাটকের একটি অঙ্ক-শেষের ঘণ্টার মতো বাজল।

এমনি সময় প্রৌঢ় কবি অঘোর সরকার একটা ভারী বড় টিন হাতে নিয়ে আসরে প্রবেশ করলেন, সবার দৃষ্টি গেল সে দিকে।

গল্প লেখক ত্রিদিব চক্রবর্ত্তী বললেন, এই যে অঘোর দা, আসুন।—আপনার হাতে ওটা কি?

অঘোরবাবু গম্ভীর ভাবে বললেন, সাহিত্য নয়।

দ্বিজু সেন বিকৃত সুরে বললেন, বলা যায় না, সাহিত্যের আদর্শ কিন্তু আজকাল টিনে ক'রেই বিদেশ থেকে আসছে।

ললিত দত্ত সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন, মাইকেল বঙ্কিম থেকেই সেটা শুরু হয়েছে, এবং সেটা আদর্শ নয়, ভঙ্গী।

সুহৃৎবাবু আবার বিপদ গণলেন।

ঔপন্যাসিক শশাঙ্কশেখর প্রথম থেকেই টিনটির দিকে কৌতূহলী দৃষ্টিতে চেয়ে ছিলেন; তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, বলুন না দাদা, সাহিত্য-সভায় টিন প্রবেশ করল কোন্ সূত্রে?

অঘোরবাবু বললেন, লোভনীয় কিছু নেই, আছে সের পাঁচেক সরষের তেল।

সবাই সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন, সরষের তেল! কোথায় পেলেন?

পেলাম অনেক কষ্টে, পশ্চিম দেশ থেকে এক বন্ধু এসেছেন, হাওড়া ষ্টেশন থেকে নিয়ে এলাম।

শশাঙ্কশেখর বললেন, আপনি ভাগ্যবান পুরুষ।

কবি ত্রিদিব চক্রবর্তীর চোখে আধুনিক বাজারের সমস্ত কালো ছবিটি মুহূর্তে ভেসে উঠল। দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে তিনি বললেন, শুধু-তেল হলেও কথা ছিল না, বাজারে মাছ নেই, দুধ নেই, ঘি নেই, কিছু নেই।

ললিত দত্ত বিরক্ত ভাবে বললেন, আর বলেন কেন! আজ পুঁটি মাছ কিনেছি তিন টাকা সের।

বিষয়টি এমনই চিত্তাকর্ষক যে মুহূর্তে সাহিত্য-বৈঠকে যেন বৈঠকখানা বাজারের হাওয়া উঠে এল।

দ্বিজু সেন উত্তেজিতভাবে বললেন, মাছ কি বলছেন আপনি!—শাক-পাত ডাঁটার অগ্নিমূল্য, কোন্‌টা পাওয়া যায়, আর কোন্‌টা কেনা যায় মনের মতো?

ললিত দত্ত বললেন, শাক-পাতা-ডাঁটা পেলেই বা খাবেন কি ক'রে? তেল কোথায়?

শশাঙ্কশেখর বললেন, সেদ্ধ ক'রে গরুর মতোও খাওয়া যেত, যদি মিলত।

অঘোরবাবু ব্যথিত স্বরে বললেন, এমনি দুরবস্থা যে উচ্ছে ভাজতে হচ্ছে ঘিতে।

দ্বিজু সেন বললেন, তবু তো ঘি পেয়েছেন উচ্ছে ভাজার। আমরা যে তাও পাচ্ছি না।

এখানে কি আর পেয়েছি? দেশের একটি লোক মণখানেক ঘি এনেছে আজ, তার কাছ থেকে কিছু কিনেছি।

ত্রিদিববাবু বললেন, অঘোরদা চিরকালই খুব জোগাড়ে। দেখছেন না, কোথায় ঘিটুকু, কোথায় তেলটুকু, ঠিক সংগ্রহ ক'রে আনছেন।

ললিতবাবু অঘোরবাবুর দিকে করুণ দৃষ্টিতে চেয়ে বললেন, আমাকে কিছু জোগাড় করে দিন না। কত ক'রে সের?

চার টাকা। খাঁটি গাওয়া ঘি।

সাহিত্য-বৈঠক কোনো সাহিত্য-কথাতেই এত বিচলিত হ'ত না। সবার মুখ থেকে একটা বিস্ময়-প্রকাশক ধ্বনি বেরিয়ে এল—"চার টাকা? খাঁটি গাওয়া ঘি?"

কবি, গল্প লেখক, ঔপন্যাসিক সবাই সমস্বরে বললেন, দোহাই দাদা, এ ঘি হাতছাড়া না হয়।

অঘোরবাবু বিরক্তভাবে বললেন, বড় ফ্যাসাদে ফেললে দেখছি। আগে বলতে হয়। [illegible] তো সে কাল সকালেই [illegible]।

সর্ব্বনাশ। তাহলে এখুনি

সাহি[illegible]-বৈঠক?

আর এক দিন হবে।

সাহিত্যের আদর্শ?

চুলোয় যাক।

সবাই মিলে অঘোরবাবুকে জোর করে টেনে বের করে নিয়ে গেল।

সভাপতি সত্যেন তালুকদারের আজ কঠিন পরীক্ষা। দুটি বিভিন্ন দলের মন রাখতে হবে তাঁকে, অথচ নিজের মতটিও ব্যক্ত করতে হবে। তিনি গভীর চিন্তায় আত্মসমাহিত ভাবে সভায় এসে স্তম্ভিত হ'য়ে দেখেন সভা শূন্য! তবে কি তাঁর তারিখ ভুল হ'ল?

ভৃত্য ছিল, সে বলল, বাবুরা সবাই এসেছিলেন।

কিন্তু কোথায় গেলেন?

ঘি কিনতে।

ঘি কি?

আজ্ঞে, অঘোরবাবু বললেন, তিনি নাকি চার টাকা সের গাওয়া ঘি কিনে দেবেন, তাই সবাই উঠে গেছেন তাঁর সঙ্গে।

কতক্ষণ গেছেন?

এই তো বাবু, পাঁচ মিনিটও হবে না।

গাওয়া ঘি, ঠিক শুনেছিস্?

তাই তো বললেন।

কোন্ দিকে গেছেন?

ঐ ট্রাম লাইনের দিকে।

ভৃত্য সত্যেন তালুকদারের চকিতে-বিলীয়মান-মূর্তির দিকে একটুখানি চেয়ে থেকে, আলো নিবিয়ে, ধীরে ধীরে দরজা বন্ধ করে দিল।

(উদয়াচল, ১৯৪৫)



শেষের হিসাব

নতুন ফ্ল্যাটে উঠে এসে পূর্বতন বাসিন্দার একখানা হিসাবের খাতা হঠাৎ হাতে এল। দেয়ালের গায়ের আলমারির মধ্যে খাতাখানা পড়ে ছিল। চুনকাম করার সময়েও কেউ এটা লক্ষ্য করেনি, আশ্চর্য। আলমারিটা তারা কেউ খোলেনি বোধ হয়। কিন্তু আগের সেই ভাড়াটিয়াই বা কেমন লোক, হিসাবের খাতাখানাই নিতে ভুলে গেছে!

খাতাখানা সরিয়ে রেখে দিলাম, খোঁজ পড়বে একদিন হয় তো তখন দেওয়া যাবে।

এ দিকে আমার সংসারের যা দুর্গতি, তাতে এই সামান্য পরোপকারের প্রবৃত্তিও এখন আমার কাছে অস্বাভাবিক বোধ হয়। জীবন রক্ষার মূল জিনিষেরই অভাব, অথচ বাঁধা আয়ে সংসার চালাতে হবে

এ অবস্থায় কার কি রইল, কার কি গেল, ভাববার প্রবৃত্তি হয় না। চোখের সামনে সব ভেঙে পড়ছে। ঘুন ধরে গেছে বাংলাদেশের জীবনে।

মাসে যা উপার্জন করি তাতে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস কিছুই কেনা হয় না। জানুয়ারি মাসের বেতন দিয়ে শুধু বিছানার চাদর কিনেছি। পরিবারের লোকসংখ্যা পাঁচ, এক সঙ্গে অনেক জিনিস কিনতে হয়। ফেব্রুয়ারি মাসের বেতন দিয়ে কিনলাম পাঁচ জোড়া জুতো। এমনি ভাবে এক এক মাসে এক এক জাতীয় জিনিস!

গ্রীক পৌরাণিক গল্পে আছে, পারসিউস, গর্গন-হত্যার অভিযানে যাবার পথে এক সময় তিনটি বৃদ্ধা ভগিনীর দেখা পায়। তাদের তিনজনের চোখ ছিল মাত্র একটি, যখন যার দেখার দরকার হ'ত সে তখন ঐ চোখটি আর একজনের কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে ব্যবহার করত। তার কথাই আজ মনে পড়ছে। বর্তমানে আমাদের দেশের এক এক পরিবারের পাকস্থলী থেকে শুরু ক'রে ছাতাটি পর্যন্ত যদি ঐ রকম একটিতে কাজ চলত!

একদিন একা বিছানায় প'ড়ে এই সব নানা অসম্ভব কল্পনায় মেতেছি, এমন সময় খেয়াল হ'ল আমার এই ফ্ল্যাটের পূর্বপুরুষটি কি ভাবে সংসার চালাতেন দেখা যাক। তাঁর সেই ফেলে-যাওয়া হিসাবের খাতাখানা খুলে শুয়ে শুয়েই পড়তে আরম্ভ করলাম। পাঁচ বছরের হিসাব। পড়তে পড়তে উঠে বসলাম। এক নিশ্বাসে সবটা পড়ে ফেলতে হ'ল। শেষ ক'রে স্তম্ভিত হ'য়ে বসে রইলাম কিছুক্ষণ। তারপর ধীরে ধীরে যখন উত্তেজনা কমে এল, বুঝলাম এর মধ্যে নতুনত্ব কিছু নেই। কিন্তু বুঝেও নিষ্কৃতি পেলাম না।

আমার নিজের হিসাবের খাতাখানাও খুলে দেখি, এই হিসাবের সঙ্গে তার আশ্চর্য মিল! এঁর শেষ হিসাব লেখা হ'য়ে গেছে, কিন্তু আমার শেষ হিসাব এখনও লেখা হয়নি—ঐ খানেই যা তফাৎ।

প্রতি মাসে আশী টাকার সযত্ন হিসাব। ভদ্রলোক মাসে মাত্র আশী টাকা বেতন পেতেন, কিন্তু বেশ বোঝা যায় তিনি কখনও ধার করেননি। তাঁর এই হিসাব থেকে আমি পাঁচ বছরের ছটি মাস বেছে নিয়েছি। এরই মধ্যে পাওয়া যাবে তাঁর ইতিহাস।

কিন্তু কোন্ এক অদৃশ্য শক্তি এই হিসাবের সঙ্গে আমার নিজের হিসাব এক সুরে বেঁধে দিয়েছে, ভাবতে গেলে আমি অস্থির হ'য়ে উঠি। তাই নিজের মনকে শান্ত করার উদ্দেশ্যে আমার আবিষ্কার-করা হিসাবের খাতা থেকে আমার বাছাই

করা ছ'টি হিসাব সবার সামনে এনে হাজির করলাম, হয় তো আরও পাঁচজনের হিসাবের সঙ্গে এর কিছু সাদৃশ্য থাকতে পারে। এটা কল্পনা ক'রেও অনেক-আরাম বোধ করছি। আমার একান্ত অনুরোধ, নীচের পাঁচ বছরের ছ'টি হিসাব আপনারা ভাল ক'রে মিলিয়ে পড়ুন।

(১) ১৯৩৯ জুলাই

বাড়ি ভাড়া	১৫৲
চাল ছ'মণ	১০৲
কাপড় ৪ জোড়া	১০৲
বাজার খরচ	৩০৲
কয়লা ৩ মণ	১৷৷০
থিয়েটার ও সিনেমা	৭৲
অন্যান্য	৬৷৷০
	৮০৲

(২) ১৯৪০ জুলাই

বাড়ি ভাড়া	১৫৲
চাল ছ'মণ	১২৲
কাপড় ৪ জোড়া	১৮৲
কয়লা ৩ মণ	২৷০
বাজার	৩০৲
অন্যান্য	২৸০
	৮০৲

(৩) ১৯৪১ জুলাই

বাড়ি ভাড়া	১৫৲
চাল এক মণ	১০৲
বাজার	৩৫৲
কাপড় ২ জোড়া	১৪৲
কয়লা ২ মণ	২৲
অন্যান্য	৪৲
	৮০৲

(৪) ১৯৪২ জুলাই

বাড়ি ভাড়া (গত জানুয়ারি থেকে সাময়িক ভাবে কম)	১২৲
চাল আধ মণ	১২৲
বাজার	৩৬৲
কয়লা	৩৲
লটারির টিকিট	৬৲
কাপড় ১ জোড়া	১০৲
অন্যান্য	১৲
	৮০৲

(৫) ১৯৪৩ জুলাই

বাড়ি ভাড়া (পুনরায় বৃদ্ধি)	১৫৲
চাল দশ সের	৭॥০
বাজার	৩০৲
কাপড় ১ জোড়া	১০৲
লটারির টিকিট	৫৲
সর্বসিদ্ধি কবচ	৫৲
ভাগ্যলক্ষ্মী মাদুলী	৫৲
কয়লা আধ মণ	১॥০
অন্যান্য	১৲
	৮০৲

(৬) ১৯৪৩ জুলাই

বাড়ি ভাড়া	১৫৲
পরিবার দেশে পাঠানোর খরচ—	১২৲
স্ত্রীর হাতে দেওয়া গেল—	৫১৸০
দড়ি ও কলসি	১।০
	৮০৲

(জনসেবা ১৯৪৩)